অন্নদাশঙ্কর রায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচী

রূপের দায়

কতকালের চেনা

শেয়ালদা স্টেশন। আসাম মেল ছাড়ছে। হৈ চৈ। হুস হাস। ধ্বস্তাধ্বস্তি। দৌড় ঝাঁপ। ভিড় কাটিয়ে জাঁদরেলি চালে চলেছে সাহেবীপোশাক পরা চিন্মোহন। সামনে পিছনে বেয়ারা ও মুটে। সারি সারি ফার্স্ট ক্লাস কামরা, কোনোটার বাইরে আঁটা নেই তার নামের লেবেল। হাতের কাছে এক রেল কর্মচারীকে পেয়ে রাশভারি গলায় বলে, "পুরকায়স্থ। ফার্স্ট। লোয়ার।"

"আসুন, সার," বলে লোকটি তাকে সমীহ করে নিয়ে যায় গার্ডের কাছে। গার্ড খাতাপত্র খুলে খুঁজে বার করে তার নাম। তার পর সঙ্গে করে নিয়ে যায় যেখানে এক পুলিশের উর্দি-পরা আরদালী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

"এই আপনার বার্থ। কিন্তু এ যে দেখছি অকুপায়েড।"

আরদালী ঘোষণা করে, "এস. আর. পি. সৈদপুর।"

গার্ড তা শুনে তটস্থ হয়ে বলে, "সর্বনাশ! বর্মণ সাহেব! আসুন, সার, আপনাকে আর একটা বার্থ দিই।"

চিন্মোহনের বয়স বাড়ছে। আর বছর দুই বাদে চল্লিশে পড়বে। ক্লান্তি বলে একটা কথা আছে। কঠিন হয়ে বলে, "আই ইনসিস্ট।"

তার বেয়ারা গার্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "সিভিল সার্জন, গৌহাটী।"

গার্ড পড়ে যায় উভয় সঙ্কটে। আমতা আমতা করে বলে, "পার্বতীপুরে তো গাড়ী বদল করতে হবেই। এই কয়েক ঘণ্টা এক সঙ্গে বসে থাকতে কি খুব কষ্ট হবে, সার?"

আরদালী ফিস ফিস করে বলে, "মেমসাহেব ভি হ্যায়।"

"দেন আই ডোণ্ট ইনসিস্ট," বলে চিন্মোহন এগিয়ে যাবার জন্যে পা তোলে। বেয়ারাও মুটেদের ইশারা করে।

এমন সময় ভিতর থেকে বাজখাঁই আওয়াজ আসে, "অর্ডারলি, সামান উতারো।" সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ষণ্ডামার্ক এক পুলিশ সাহেবকে।

"দুঃখিত।" ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "জানতুম না এটা রিজার্ভড।"

চিন্মোহন আপ্যায়ন করে বলে, "আপনাকে যেতে হবে না, দাদা। সঙ্গে ভদ্রমহিলা রয়েছেন।"

"কুছ পরোয়া নেহি। গায়ে ইউনিফর্ম রয়েছে!"

চিন্মোহন লক্ষ্য করে যেমন তেমন কোটাল নয়, কুলীন কোটাল। আই. পি.। খাতির করে বলে, "মুলুকটা বাংলা। আপনারাই তার রয়াল বেঙ্গল টাইগার। হতো যদি আসাম, আমিও আমার ইউনিফর্ম দেখাতে পারতুম।"

"ওঁকে ভিতরে নিয়ে এসো।" হুকুম করেন টাইগ্রেস।

চিন্মোহনকে অগত্যা উঠতে হলো সেই কামরায়। বসতে

হলো তাঁদের পাশে। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা জাত সাহেব মেম। তাঁরা অন্য দিকের বার্থে।

"আমরা তিন জন ভারতীয়।" শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা।

এদিক ওদিক চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করলেন তাঁর স্বামী, "অথচ আমাদেরই সংখ্যা কম।"

"মর্মে মর্মে অনুভব করছি, দাদা।" ঝুঁকিয়ে বসে সিগরেট অফার করল চিন্মোহন। উভয়কেই। অবশ্য নিলেন না ভদ্রমহিলা।

ভাব হয়ে গেল। ততক্ষণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে।

"আমার নাম বর্মণ। ইণ্ডিয়ান পুলিশ।"

"পুরকায়স্থ। মেজর। আই. এম. এস.।"

"আরে!" বলে বর্মণ হাতে হাত মেলালেন। এমন করে ঝাঁকালেন যেন কতকালের চেনা।

"কে? চিন্মোহন?" ভদ্রমহিলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। যেন চেনা চেনা ঠেকছে, অথচ স্বীকার করতে বাধছে।

"মাফ করবেন। মনে পড়ছে না।" চিন্মোহন তো হতভম্ব।

"মনে পড়বে কী করে? দেখলে কবে যে চিনবে? তোমার ছোটকাকিমা আমার বড়দি।"

"ওঃ! মিলি!" চিন্মোহন বর্মণের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলল, "মিলি বলছি বলে কিছু মনে করছেন না তো? ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি মিলি, মিলি, মিলি! ভালো নাম কি কেউ বলেছে যে মনে থাকবে?"

"ভালো নামটাই আমি শুনে আসছি। ডাকনামটা কি চিনু ?"

"আঃ! ঠিক ধরেছেন।"

"আমার ভালো নাম জানতে চাইলে না ? উর্মিলা।"

বর্মণ এত ক্ষণ চুপ করে সিগরেট খাচ্ছিলেন। সিগরেট মুখে রেখে বললেন, "বাসবজিৎ।"

আলাপ জমে উঠল।

"আপনাকে আমার মাসি বলা উচিত। আর আপনাকে মেসো।"

"শুধু মিলি বললেই আমি খুশি হব, চিনু। আমি বয়সে ছোট, যদিও সম্পর্কে বড়।" মিলি খুলে বলল না। প্রায় বছর পাঁচেকের তফাত।

"আমাকে মেসো বললে আমি খুবই অপ্রস্তুত হব। লোকে ভাববে আমার বয়সের গাছপাথর নেই।" বাসব বলল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। "ভিক্টোরিয়া যে বছর মারা যান সেই বছর আমার জন্ম।"

"তা হলে আপনি ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক নন।"

"সেইজন্যেই তো অনুরোধ আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দিয়ো না।"

চিন্মোহন মিলির দিকে তাকাতেই সেও বলে উঠল, "আমাকেও।"

এই ট্রেনে আগেকার দিনে করিডোর থাকত। কী মজা! যখন ইচ্ছা বেল টিপলেই রেস্টোরান্ট কার থেকে খানসামা

ছুটে আসত। সে করিডোরও নেই। সে বেলও নেই। আসাম মেলে চড়ে সুখ কী!

"চুয়াডাঙ্গায় চায়ের অর্ডার দিয়ে রাখা যাবে? পোড়াদায় চা।" বাসব বলল শুকনো গলায়।

"কেন? চা কি আমার থার্মোফ্লাস্কে নেই ভেবেছ!" মিলি বলল উজ্জ্বল হয়ে। শ্যামা মেয়ে। কিন্তু সর্বাঙ্গে আনন্দলহরী বাজছে। পূর্ণযৌবনা।

"না, না, এই তো টিফিন খেয়ে বেরোলুম। এখন চা খেলে পোড়াদায় কী খাব? চিন্মুর সঙ্গে আলাপ হলো, সেলিব্রেট করতে হলে অর্ডার দিতে হয়। নাথিং লাইক এ রেস্টোরান্ট কার।"

চিন্মোহন কৃতার্থ হয়ে বলল, "ঐ থার্মোফ্লাস্কই আমার যথেষ্ট। যখন খুশি ঢেলে খাওয়া যাবে। কী বল, মিলি?"

"আসলে উনি চান রেলে চড়ার ষোলো আনা স্বচ্ছন্দ্য। আমেনিটি। থার্মোফ্লাস্কে চা তো যে কোনো জায়গায় খাওয়া যায়।"

"রাইট ইউ আর। সেবার কন্টিনেন্টে গিয়ে যে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি, এমন কি এই দেশেরই অন্যত্র যা পেয়েছি এ লাইনে তা কোথায়?" বাসব হাহুতাশ করল।

এর পরে দেশবিদেশের গল্প। চিন্মোহন সৈন্যদলের সঙ্গে বহু বছর থেকেছে। বহু স্থানে ঘুরেছে। সিভিল সার্জন আর ক'দিন!

"তার পরে? হোয়াট্‌স্ হ্যাপ্‌নিং টু ইউ?" প্রশ্ন করল

বাসব। তার চিরকেলে প্রশ্ন। যার সঙ্গে আলাপ হয় তাকেই করে।

“ফিরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব রাওলপিণ্ডি।”

“কেন ? উজিরদের সঙ্গে বনছে না ?”

“না। ‘ভারতীয়’ ‘ভারতীয়’ বলে চ্যাঁচালে কী হবে ? মানুষ কোথায় ?”

“সেই কথাটাই বলো দেখি ওই ভারতনারীকে ! শুনলে তো ? চিনু কী বলল ?”

মিলি ও কথায় কান দিল না। দু’বেলা আসছে। ‘হোয়াট্‌স্ হ্যাপ্‌নিং টু ইউ ?’ সার্ভিসের লোকের মুখে ও ছাড়া কথা নেই।

“যুদ্ধ বাধবে নাকি ? তোমার কী মনে হয়, চিনু ?”

“আমি তো সেই আশায় আছি। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া চাই। নইলে আই. এম. এস. হয়ে সার্থকতা কী ? শিলং-এ প্র্যাকটিস করতে পারতুম। মা বাবা তাই চেয়েছিলেন। কোথায় বিয়ে দেবেন তাও ঠিক করে রেখেছিলেন। হা হা ! চিনতেন না চিনুকে।”

“ও কী ! বিয়ে হয়নি তোমার ! আর কবে করবে !” বিমর্ষ হলো মিলি।

“এ জন্মে নয়। যুদ্ধে গেলে বাঁচব কি-না কে জানে ! মিছিমিছি একজনকে কাঁদিয়ে কী সুখ !” চিনু বলল নিঃস্পৃহভাবে।

“তা হিটলারের সঙ্গে লড়াই যখন, প্রাণে বাঁচা দায়।

তোমার দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়।” বলে আর একটা সিগরেট ধরাল বাসব। তার আগে চিনুকে অফার করল।

“তোমরা আমাদের মেয়েদের কী যে ভাব! আমরা কি ভারতের বীরাঙ্গনা নই? ঐ যে রামায়ণে সুভদ্রার গল্প আছে—”

“মহাভারতে!” সংশোধন করল বাসব।

“আঃ! আমাকে বলতে দাও। কেবল ভুল ধরবে। বুঝলে, চিনু! রেঙ্গুনের মেয়ে। স্বদেশের কতটুকুই বা জানি! কে শেখাবে, বল! বিয়ের আগে তো এমন কি রাধাকৃষ্ণের গল্পও জানতুম না।”

“তবু ভারত বলতে অজ্ঞান!” কটাক্ষ করল বাসব।

“কিচ্ছু আসে যায় না।” চিনু অভয় দিল। “কথা হচ্ছে এই। আমাদের মেয়েরা বীরাঙ্গনাই বটে। আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে যদি সরল মনে বিদায় দিতে না পারে তা হলে তো আমার যুদ্ধে যাওয়া হয় না। না, হয়?”

মিলি চট করে এর জবাব দিতে পারল না। ভাবতে লাগল।

বাসব ততক্ষণে চিত্রপত্রিকা খুলে তার প্রিয় ব্যসন ক্রসওয়ার্ড নিয়ে অন্যমনা হয়েছে। কথাবার্তা এর পর থেকে চলল মিলিতে আর চিনুতে।

২

পোড়াদায় চা পান হলো। সান্ধ্যাহারেও তার জের চলল। আলাপ জমতে জমতে এমন হলো যে কারো মনে রইল না মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেনা।

পার্বতীপুরে যখন ট্রেন থামল তখন হুড়মুড় করে এক পাল পুলিসের লোক এসে কামরায় ঢুকল। এরাই কুলী হয়ে মাল নামাল। এরা এক এক করে সেলাম ঠোকে আর বাসবের উচ্চতা এক এক ইঞ্চি করে বেড়ে যায়। সে চিন্নুর দিকে অনুকম্পাভরে তাকায় আর প্রাণের পুলক প্রাণপণে চাপে। তার সেলুন জোড়া হয়েছে সৈদপুরের শাটল ট্রেনের সঙ্গে। দেখুক চিন্নু।

প্লাটফর্মে নেমে বাসব তার ইনস্পেক্টর সাবইনস্পেক্টরদের মিছিল নিয়ে জি. আর. পি. পরিদর্শনে চলল। যে ক'দিন ও ছিল না সেই ক'দিনে না জানি কী গণ্ডগোল বেধে গেছে। তিনটে দিনও কি ছুটি নেবার জো আছে! অধীনস্থরা জানত বর্মণের কোথায় দুর্বলতা। বলল, "ভীষণ ব্যাপার, সার। আপনি না থাকলে দেখছি চোর ডাকাতরাও মাথা চাড়া দেয়। আপনি যে নেই এ খবরটা ওরাও রাখে।"

ওদিকে চিন্নুর বেয়ারা মুটে ডেকে নিয়ে এলো মিটার গেজের আসাম মেলের জন্যে। তা দেখে মিলি বলল, "তুমি কি সত্যি সত্যি যাচ্ছ নাকি? আমি বলি তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। একটা দিন কামাই করলে যদি তোমার চাকরি

না যায় তা হলে জীবনে একটা দিন একটু আনন্দ করা যাবে। কাল আবার এখানে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাব তোমাকে।"

চিনু আর করে কী। দু'চার বার ওজর আপত্তি দেখিয়ে শেষে যা বলল তার তুলনা হ্যাড়া, খাবি? হাত ধোব কোথায়? "তোমাদের কষ্ট হবে না তো?" বেয়ারাকে ইশারা করল মাল সেলুনে তুলতে।

"তোমাকে না জানিয়ে একটা অপরাধ করে ফেলেছি।" মিলি বলল বাসবকে। "চিনু আমার কথায় এক দিনের জন্য সৈদপুর যেতে রাজী হয়েছে।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমিও তোমাকে আমন্ত্রণ করছি, চিনু।" বাসব এমনভাবে হাত পা ছড়িয়ে বসল যেন সেলুনটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। সেলুন দেখুক, বাঙলো দেখুক, বাসবের রাজত্ব দেখুক চিনু। সেলামের বহরটাও দেখে যাক।

স্টেশন খালি করে পুলিশের লোক এসেছিল বাসবকে সেলুনে তুলে দিতে। তাদের একজন বলল, "আমরাই পারব, তবে সার স্বয়ং থাকলে আরো ভালো দেখায়।"

বাসব হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "নো পার্ট অফ মাই ডিউটি। এসব মাশরুমের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা মিনিস্টারদের জানা উচিত যে আমি এদের রিসিভ করতে বাধ্য নই।"

গাড়ী ছেড়ে দেবার পর বাসব আফসোসের সুরে বলল, "জিভটা আমার বেয়াড়া। এই জিভটার জন্যে আমি অনেক ভুগেছি। আরো ভুগব। ঐ ছোট মিনিস্টার ফিরে গিয়ে বড়

মিনিস্টারের কান ভারী করবে। পরের দিন টেলিগ্রাম আসবে, বরিশালের য়্যাডিশনাল এস. পি.।”

চিনু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, “না, না, তেমন কিছু হবে না। উপরে গবর্নর রয়েছেন। তুমি একজন সিনিয়র আই. পি.।”

ও কথা কানে গেল না বাসবের। “খান বাহাদুরকে ডিনার দেবার জন্যে মিলিকে বলা বৃথা। কোনো দিনই ওসব করল না। নেহাত দু’চারজন সার্ভিসের বন্ধু ছাড়া আর কাউকেই ও ডাকবে না। আমারি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমাকে বলবে, নো পার্ট অফ মাই ডিউটি। এই যে পদোন্নতি দেখছ, চিনু, এর সমস্তটাই আমার যোগ্যতার দরুণ। এক রত্তিও খোসা-মোদের দরুন নয়। আমার কাজের ‘এ’ থেকে ‘জেড’ পর্যন্ত আমার নখের ডগায়! কিন্তু এত করেও কি শান্তি আছে! কাল যদি পার্বতীপুরে সকাল সাড়ে ছ’টায় হাজিরা না দিই তবে চললুম আমি বরিশালে নৌকো চড়তে। রেল ও জেলায় নেই।”

মিলি বলল, “বেশ তো, যাও না হাজিরা দিয়ে এসো। আমি দেখব চিনুকে। আগে থেকেই খারাপটা ভেবে মন খারাপ করছ কেন?”

সৈদপুরে নেমে ওরা মোটরে করে বাঙলোয় গেল। তারপর যে যার ঘরে ঢুকল কাপড় ছাড়তে, গোসল করতে। শীত কাল। গরম জল তৈয়ার ছিল। বাথ টাবে গা মেলে দিয়ে চিনু ভাবতে লাগল, কী আশ্চর্য এই দিনটা! মিলির সঙ্গে

এ জীবনে দেখা হবে কে জানত এ কথা। চিন্ময়র বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি।

ডিনারের ঘণ্টা বাজতেই কোনো মতে পোশাক পরে নিয়ে হাজির হলো চিন্মু। মিলি একা বসে আছে, বাসব অন্য ঘরে টেলিফোনে কথা বলছে। কাল সকালে পার্বতীপুর রিফ্রেশমেন্ট রুমে ও ব্রেকফাস্ট পার্টি দেবে মহামান্য মন্ত্রীকে। যদিও তিনি সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। পুলিশ বিভাগের না।

"তুমি যাচ্ছ নাকি ব্রেকফাস্ট পার্টিতে?" জানতে চাইল চিন্মু।

"আমি!" জ্বলে উঠতে উঠতে হেসে উঠল মিলি। "উনি আমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। মহিলা দু'পাঁচ জন থাকবেন বইকি। নইলে মন্ত্রীরা ক্ষুণ্ণ হন। যদিও তাঁদের বেগমদের বা রানীদের পর্দার বাইরে আনবেন না। বড় বড় রেলওয়ে অফিসারদের মেমসাহেবরা গ্রেস করবেন। তাঁরাই এখানকার সর্ব ঘটে।"

তিক্ততায় মিলির মুখ বিরস হয়েছিল। চিন্মু বুঝতে পারছিল না কেন। সারা পথটা যে মেয়ে ফুর্তি করে এলো বাড়ী এসে সে কি তেতো ওষুধ খেলো?

অবশেষে বাসব এসে যোগ দিল। খানা আরম্ভ হলো।

"কাল ভোরেই স্পেশাল ছাড়বে। মিসেস টমসন, মিসেস ডিকসন, মিসেস হ্যারিসন এঁরাও যাবেন। বিশ জন অতিথির জন্যে 'কভার' পাতা হবে। এখন মন্ত্রী রাজী হলে

হয়। তাঁকে তো ধরতে পারা যাচ্ছে না। তিনি এখন রাজশাহীতে।” বাসব দুঃখ করল।

“তা হলে তোমার বরিশালে বদলি হওয়া হলো না দেখছি। আমারও বাংলাদেশের সবটা দেখা হলো না।” দুঃখ করল মিলি।

“হবে, হবে। এক দিন ডি. আই. জি. হয়ে যাব হয়তো ওখানে। কিন্তু—”

“য়্যাডিশনাল এস. পি.! প্রাণ থাকতে নয়। তার চেয়ে যত বার খুশি মন্ত্রীপূজা করা যাবে। কিন্তু সামান্য ব্রেকফাস্টে কি দেবতারা তুষ্ট হবেন?” মিলি বলতে লাগল, “আর ওঁরা যখন প্রশ্ন করবেন, কই, মিসেস বর্মণকে তো দেখছিনে, তখন কী উত্তর দেবে তুমি? প্রত্যেক বারই কি আমি অসুস্থ?”

বাসবের মন ভালো ছিল না। ডিনার শেষ হতেই মাফ চেয়ে শুতে চলে গেল। কাল তাকে রাত থাকতে উঠে দাড়ি কামাতে হবে। ইউনিফর্ম পরতে হবে। ফুল ইউনিফর্ম।

“তুমিও চললে নাকি? না, না। বোসো। একটু আগুন পোহানো যাক।” বসবার ঘরে কয়লার আগুন জ্বলছিল দেয়ালের অগ্নিস্থলীতে। মিলি ও চিনু দু’জনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে জমিয়ে বসল।

কফি এলো। কফির পেয়ালায় কফি ঢালা হলো। বিদায় নিয়ে চলে গেল চাকরবাকর। নিঃঝুম হয়ে এলো চার দিক। গল্প করতে করতে রাত গভীর হলো। কারো

দৃষ্টি নেই ঘড়ির দিকে। এমন কড়া কফি যে চোখ থেকে ঘুম ফেরার।

ছেলেবেলার গল্প। মিলিরা তখন রেঙ্গুনে আর চিন্নুরা শিলং-এ। কেউ কাউকে দেখতে পায় না, অথচ মিলির সব খবর মিলির দিদির দৌলতে চিন্নুর নখদর্পণে। শুধু খবর নয়, ফোটো যে কত রকমের কত শত তার লেখাজোখা নেই। দিদির আলবামে আর টেবলে আর দেয়ালে-দেয়ালে মিলির আনন্দ উজ্জ্বল মুখ। হাজারখানা ছবি বিভিন্ন বয়সের। সাত আট থেকে আঠারো উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তার পরে ব্ল্যাক আউট। বিয়ের পর মিলি ফোটো পাঠায়নি। যদি পাঠিয়ে থাকে তবে চিন্নু জানে না।

অসাধারণ হাসিখুশি মেয়েটি। কখনো তার মুখে অহাসি অখুশি দেখা যায়নি। আর তেমনি ডানপিটে দুরন্ত ঘরছাড়া বাহির বেড়ানো মেয়ে। এই সাঁতার কাটছে তো এই ঘোড়ায় চড়ছে। এই সাইকেল চালাচ্ছে তো এই টেনিস খেলছে। সব খেলায় চৌকষ। রাশি রাশি মেডাল পেয়েছে লাট-বেলাটের হাত থেকে।

তা বলে সে লেখাপড়ায় মন্দ ছিল না। গানেও তার উৎসাহ ছিল। সেতারের হাত ছিল তার, আর ছিল স্কেচ করার শখ। দিদির কাছে পাঠানো স্কেচ চিন্নুও দেখেছিল দেখে তারিফ করেছিল।

মিলি তার জীবনের বিচিত্র ঘটনাও রঙিয়ে রসিয়ে চিঠিতে লিখত। সেসব চিঠি এত মজার যে দিদি একা উপভোগ

করতে চাইতেন না, চিন্নুকে পড়তে দিতেন। চিন্নু আমোদ পেত। বলত, "ছোট কাকিমা, তোমার বোনটি একটি য়্যালিস। য়্যালিস ইন বার্মা।"

সেই মিলির সঙ্গে এত কাল পরে দেখা। একশোটা স্মৃতি একসঙ্গে জাগছিল। কোনোটা মিলির আট বছর বয়সের, চিন্নুর তেরো বছর বয়সের। ছাগলছানা কোলে নিয়ে তোলা ফোটো। কোনোটা মিলির বারো বছর বয়সের, চিন্নুর বয়স যখন সতেরো। প্যাগোডা দেখতে গিয়ে মিলি হারিয়ে গেছল। দারুণ য়্যাডভেঞ্চার। কোনোটা মিলির ষোলো বছর বয়সের, চিন্নুর বয়স তখন একুশ। এক বাঙালী মহিলা এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। বলেন, মধ্যবিত্তের বাড়ী আগেও আশ্রয় নিয়েছি। তিনি নাকি কোন এক অভিজাত বংশের কন্যা, স্বদেশী করতে গিয়ে ফেরার হয়েছেন। মাসের পর মাস যায়, নড়তে চান না, শেষে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর আত্মীয়দের তল্লাস পাওয়া যায়। অভিজাত না, ফেরারী না, পলাতকা।

চিন্নুর মন সব কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিল। কবেকার সব ঘটনা। কেই বা মনে রেখেছে সেসব! মিলির একে একে মনে পড়ছিল আর অবাক লাগছিল চিন্নুর স্মরণশক্তি দেখে।

আগুন যত বার নিবে আসছিল তত বার উস্কে দিচ্ছিল চিন্নু। আরো কয়লা ঢালছিল। আর ভাবছিল এত কথাও তার মনে ছিল। এত কাল মনে ছিল। এক দিন আগেও তো এসব মনে পড়েনি। দেখা হলো হঠাৎ। অমনি খুলে গেল অতীতের অর্গল।

উনিশ বছর বয়সে মিলির বিয়ে। তার পরে যেসব চিঠি আসে সেসব অন্য জাতের : ছোটকাকিমা চিনুকে দেখতে দেন না আর। এই ভাবে একটা ছেদ পড়ে যায়। শেষের চিঠিখানা বিয়ের সম্বন্ধ হবার সময় লেখা। মিলির বিশেষ রুচি ছিল না। তার দিদিরও না। কিন্তু গুরুজনের মতে অনিশ্চিত রাজপুত্রের চেয়ে নিশ্চিত কোটালপুত্র ভালো।

বলতে বলতে এক মুহূর্ত অসতর্ক হয়েছিল চিনু। বলে বসল, "মিলি, তুমি কি জানতে না ছোটকাকিমার ইচ্ছা ছিল যে—"

মিলির মুখে যেন কেউ আবীর মাখিয়ে দিল। সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

চিনু বারবার মাফ চাইতে থাকল, লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই সে লাফিয়ে উঠল। "সর্বনাশ। পৌনে দুটো। গুড নাইট, মিলি।"

মিলি কাঁদছিল। কথা বলল না। শুধু একটা হাত তুলে রুমালের মতো নাড়ল।

৩

পরের দিন ঘুম ভাঙতে প্রায় ন'টা বাজল চিন্মোহনের। অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ভিজে বেড়ালটির মতো সে যখন ব্রেকফাস্ট টেবলে হাজির হলো তখন শুনল সাহেব পার্বতীপুর চলে গেছেন, মেমসাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে এই একটু আগে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কোনোমতে কিছু মুখে দিয়ে সে বসবার ঘরে গেল সময় কাটাতে। ম্যাণ্টেলপীসে ও তার আশেপাশে মিলির ছেলের ফোটো রাশি রাশি সাজানো। নানা বয়সের। দেয়ালে মিলির আঁকা স্কেচ। এক কোণে একটা সেতার। বাসবের শিকারের ট্রোফি ছিল একটা বাঘের মাথা ও বাঘছাল। দেখতে লাগল ঘুরে ফিরে। আর ভাবতে লাগল কী সুখী এই তিনজনের ছোট একটি সংসার। জীবনের সার্থকতা এরাই পেয়েছে। পাক।

সিগরেটের পর সিগরেট খেয়ে চলেছে চিন্মোহন। নিজের জন্যে তার আফসোস নেই। ছোট কাকিমার ইচ্ছা ছিল, তার নিজের ছিল কি না সন্দেহ। সে বিবাহবিমুখ ছিল বরাবর। তবু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে মিলি তার মনের মতো সঙ্গিনী ছিল। যাকে নিয়ে আজ খাইবার, কাল পিণ্ডি, পরশু কোয়েটা, তরশু রানিখেত—ঘূর্ণী হাওয়ার মতো ঘুরে বেড়ানো উড়ে বেড়ানো চলত।

“ওঃ! তুমি বসে বসে কড়িকাঠ গুনছ!” শুনে চমকে উঠল চিন্মোহন। যেন ধরা পড়ে গেছে চুরি করে ভাবতে ভাবতে। তার পিছনে মিলি। মিলির হাতে মরসুমী ফুলের বিচিত্র তোড়া। চিন্মোহন দাঁড়িয়ে শুভ সম্ভাষণ করতেই সে ফুলের তোড়া বাড়িয়ে দিল। তারপর একটা চেয়ারে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল।

“তোমাকে জাগাইনি বেড টী খেতে। খুব ক্ষিদে পেয়েছিল নিশ্চয়।”

"না, তেমন কিছু নয়। আমি ক্ষিদের চেয়ে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলুম।"

"কেন, লজ্জার কী আছে! কাল তুমি যা বললে তা সত্যি। বড়দির ইচ্ছা ছিল, ছোট বোনের যে অনিচ্ছা ছিল তা নয়, কিন্তু একজন যদি প্রস্তাব না করে, আরেকজন যদি করে তা হলে মেয়েরা এক্ষেত্রে নিরুপায়। তুমি এসেছ, ভালো হয়েছে। একটা ভুল বোঝার অবসান হলো। কিন্তু চিনু, আমার কী মনে হচ্ছে, জানো?"

চিনু লক্ষ্য করল মিলির চোখের কোলে অনিদ্রার ছাপ। বলল, "কতক্ষণ আগে উঠেছ?"

"কে? আমি? আমি তো কাল চোখ বুজতে পারিনি। সারা রাত সারা জীবনের ছবি দেখেছি। যেন সিনেমার অভিনয় চলছিল।"

"এত দুঃখিত হলুম শুনে!"

"দুঃখের কী আছে! এক রাত ঘুম না হলে কেউ মারা যায় না। মরে অন্য কারণে। আমি যদি মরি তা হলে জেনো আমার উপায় ছিল না।"

লাফ দিয়ে উঠল চিনু। "ও কি সর্বনেশে কথা কথা বলছ, মিলি!"

"বোসো। আমার ভয়ডর কোনো দিন ছিল না, এখনো নেই। মরতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। যে কষ্ট পাচ্ছি তার তুলনায়।" মিলির কণ্ঠে হতাশা।

"ভালো ট্রীটমেণ্ট চাই। সৈদপুরে ডাক্তার কোথায়

পাবে ? কিন্তু ট্রাবলটা কী ? জানতে পারি ? প্রশ্নটা ডাক্তার হিসাবে করছি।" চিনু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল।

"তা নয়। আমার যে সিকনেস তা শরীরের নয়, মনের। আই য়্যাম সিক য়্যাণ্ড টায়ার্ড অফ ইট অল।" মিলি মুমূর্ষুর মতো এলিয়ে পড়েছিল।

কৌতূহল প্রকাশ করা শোভন হবে না বলে চিনু চুপ করে থাকল। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ব্যস্ত ছিল তার আঙুল।

"আমার কী মনে হচ্ছে, জানো ?" মিলি আবার বলল সেই কথা। "মনে হচ্ছে আমার জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তোমাকে আমার প্রয়োজন ছিল, নইলে অমন অকস্মাৎ দেখা হতো না কাল। তিন মাস কলকাতায় থেকে কিছুই করতে পারলুম না আমি, উনি আমাকে ধরে না নিয়ে এলে আরো তিন মাসেও কোনো সুরাহা হতো না আমার।"

মিলি একটু একটু করে ভেঙে বলল তার দাম্পত্য জীবনের কাহিনী। এক সঙ্গে নয়। তবে লিখতে হচ্ছে এক সঙ্গে গুছিয়ে।

বিয়ের পর সে তার স্বামীর সঙ্গেই বাংলাদেশের মহকুমায় মহকুমায় জেলায় জেলায় ঘুরছে। মাঝখানে কিছু দিন ছুটি নিয়ে বাইরে বেড়িয়েছে দু'জনে। এই যে চাকরি এতেও ঘোরাফেরার সুযোগ প্রচুর। সেলুন পাওয়া যায়। চাইলেই হলো।

কিন্তু বিয়ে যাকে করেছিল সে একদা মানুষ ছিল! এখন

আর তাকে মানুষ বলা চলে না। ম্যান নয়, পুলিশম্যান। তার জীবনের একমাত্র অভিলাষ সে পুলিশের বড়কর্তা হবে। আই. জি. কিংবা কমিশনার অফ পুলিশ। এর জন্যে তার সাধনার ত্রুটি নেই। প্রত্যেকটি এজাহার সে নিজে তদন্ত করবে, প্রত্যেকটি চোর ডাকাত সে নিজে পাকড়াও করবে, প্রত্যেটি মামলা সে নিজে সাজাবে। মাসের মধ্যে বিশ দিন সে টহল দিয়ে ফিরবে। কখনো গোরুর গাড়ীতে, কখনো ডিঙি নৌকায়, কখনো ঘোড়ার পিঠে, কখনো মানুষের ঘাড়ে। এলাকার অন্ধিসন্ধি তার নখের ডগায়। থানার দারোগারা তার ভয়ে থরথর। বিনা নোটিসে কখন কোন্ দিকে উদয় হবে। বলবে, এই, তোমার গায়ে ইউনিফর্ম নেই কেন? লুঙ্গি পরে চাকরি করবে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বদলি করবে, নয়তো সাসপেণ্ড। নিজে দৌড়বে, দৌড় করিয়ে মারবে বুড়ো বুড়ো ইনস্পেক্টরগুলোকে।

তিনখানা বই ওর নিত্যপাঠ্য। গীতা চণ্ডী পাঁজি নয়। ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড, পুলিশ রেগুলেশনস্, বেঙ্গল সিভিল লিস্ট। ওর উপরে কে কে আছে, নিচে কে কে আছে, কবে কোথায় কোন পোস্টে নিযুক্ত হয়েছে, ক'বছর ক'মাস ক'দিন চাকরিতে রয়েছে, কবে ছুটি পাওনা, কবে অবসর নিতে বাধ্য, কোন কোন পদ খালি হবে, কার কার দাবী বিচারযোগ্য, কার কার রেকর্ড খারাপ এসব কেবল যে মুখস্থ তাই নয়, এর উপর ভিত্তি করে সে নিজের জন্যে একটা আকাশজোড়া কেল্লা গড়ে তুলেছে। অমুকের জায়গায় অমুক

গেলে অমুক হবে অমুক, তারপর আমি হব অমুক। আমাকে টপকে যদি অমুক এগিয়ে যায় তা হলে আমি এ প্রাণ রাখব না। এত বড় অবিচার!

অথচ এমনি একটা অবিচার ঘটে গেল একবার য়্যাণ্ডারসনী আমলে। সাধারণ চোর ডাকাত ধরে নাম করলে কী হবে, সরকারের রাজস্ব যে চুরি যেতে বসেছে, চোর যে তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের থেকে শুরু করে সত্তর-বাহাত্তর বয়সের বুড়োবুড়ীরাও। সব বাঙালী হিন্দু। ভুলেও একটা মুসলমান ধরেছ কি তোবা তোবা করে ছেড়ে দিতে হবে। বাসব মাছ ধরতে গিয়ে কাঁকড়া ধরেছিল। যদিও মাছের সংখ্যা তাতে কমেনি তবু সরকারকে বিব্রত করা তার পক্ষে সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। রিপোর্ট গেল যে বর্মন আর সব বিষয়ে চৌকষ হলে কী হবে, নট ভেরি ইনটেলিজেণ্ট। য়্যাণ্ড রাদার কমিউনাল। সামলাও ঠেলা। পূর্ববঙ্গ থেকে পত্রপাঠ বদলি উত্তর বঙ্গে। দিনাজপুর। তারপর গোটা কয়েক সন্ত্রাসবাদী দল ধরা পড়ায় তার সুদিন এলো। তাকে দেওয়া হলো ভারতীয়দের পক্ষে যা স্বপ্নাতীত। দার্জিলিং-এর এস. পি. পদ। অবশ্য সাময়িক।

সেখানে ক্লাবে ঢুকতে গিয়ে দেখল কেউ তাকে পাত্তা দেয় না, তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন সে অনধিকার প্রবেশ করেছে। অভিমান করে ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিল। ফলে সরকারী কাজের যে অংশটা ঘরোয়া ভাবে ক্লাবে খানাপিনা করতে করতে নিষ্পন্ন হয় সেটার জন্যে ডি. সি'র বাড়ী ছুটতে

হয় এস. পি'কে, এস. পি'র বাড়ী ডি. সি'কে। ডি. সি'র এত সময় কোথায়, আর ডি. সি. যদি পাঁচ বার আসেন এস. পি. কেন দশ বার যাবে? আবার মান অভিমান। এবারও সরকার বিব্রত হলেন। রিপোর্ট গেল, বর্মণ নোজ হিজ জব, কিন্তু কাজের লোক হলে কী হবে, নট ভেরি ট্যাক্‌টফুল। য়্যাণ্ড রাদার রেস-কনসাস।

স্বর্গ হইতে বিদায়। ছেলেকে দার্জিলিং-এর সেন্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী চলল রংপুর। বাসব সমস্ত ক্ষণ গজ গজ করতে থাকল। তার চাকরিতে একটা সেটব্যাক হয়ে গেল। চাকরির ইতিহাস বলে যে পুঁথিখানা ছিল সেখানা খুলে বার বার পড়ল। হায়, হায়, পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল এত কালের তপস্যার পরে! আর কার কার জীবনে এমনটি হয়েছে তুলনা করে সান্ত্বনা খুঁজল। তখনো তার আশা ছিল তার পুরোনো আই. জি. বিলেত থেকে ফিরলে পরে এর একটা বিহিত হবে। আই. জি. তো ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গে বর্মণের কানে এলো, সরকারী মহলের সিদ্ধান্ত নাকি এই যে বর্মণ দারোগা ভালো, কিন্তু তার রাজনৈতিক বা সামাজিক বাস্তব-বোধ নেই। বেচারা বুঝতে পারে না যে বিদেশী প্রভুদের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ করতে না জানলে আর সব গুণ থাকা না-থাকা সমান বৃথা। তা তুমি যত বড় কর্মঠ ও যোগ্য পুরুষ হও না কেন। সেই ইস্তক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তববাদ চর্চা।

এদিকে মিলির ইহকাল পরকাল গেছে। বাংলাদেশের

মফঃস্বলে কোথায় ঘোড়ায় চড়বে, সাঁতার কাটবে? বাসব অপদস্থ হবে বলে সে সাইকেলে চাপে না। যেখানে যেখানে ইউরোপীয় ক্লাব আছে সেখানে সেখানে টেনিস আছে, কিন্তু তারা ঠিক প্রাণ খুলে মেশে না। তাদের বিশ্বাস সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সকলেরই অল্পবিস্তর যোগ আছে, মিলিরও। নেই যে, এ কথা বুকে হাত দিয়ে বলা যায় কি? যখনি একটা সাহেব খুন হয় মিলি কি ব্যগ্র হয়ে ওঠে না খুনীকে বীর বলে বন্দনা করতে? আবার সেই বীর যখন ফাঁসীর মঞ্চে ওঠে তখন মিলির কি খুন করতে ইচ্ছা যায় না যারা তাকে ধরেছে বা ধরতে সাহায্য করেছে তাদের সবাইকে? বাসবকেও?

ক্লাবে নাই বা গেল। নিমন্ত্রণ ভদ্রতা আতিথেয়তা এসব বাদ দিলে জীবনে কী থাকে! বিশেষ করে বাংলার মফঃস্বলে। কিন্তু একে একে বাদ দিতে হলো এসব। না দিলে দেশের কাছে অপরাধী মনে হতো। যারা আমাদের ভাইদের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখছে দেউলিতে বক্‌সায়, আন্দামানে পাঠাচ্ছে, ফাঁসী দিচ্ছে, তারা ডেকেছে বলে তাদের বাড়ী যেতে হবে, তাদের ডাকতে হবে নিজের বাড়ীতে? কক্ষনো না। নাই বা হলো স্বামীর প্রমোশন। প্রমোশন চাও তো যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করো। বিবেকের নির্দেশ অমান্য না করে ঈশ্বরের দয়ায় উন্নতি করো। খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকতে যাও কেন?

বদলির গোলমালে, স্বামীর সঙ্গে সফর করতে করতে, সন্তান যদিও একটি, তবু সেই একটিকে মানুষ করতে করতে

মিলির নিজের যেটুকু প্রতিভা ছিল—প্রতিভা না বলে সাধনা বলা যাক—সেটুকুও অন্তর্ধান করেছে। সে আর না বাজায় সেতার, না আঁকে ছবি। এমন কি ভালো একখানা বই পড়তেও তার তেমন আগ্রহ নেই। পড়ে ডিটেকটিভ নভেল। দিন রাত খুনজখমের খবর শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে তার একরকম নেশা লেগে গেছে। বীরত্বের কাজ কিছু করতে পারল না জীবনে, তাই বিকৃত হলো তার বীরত্ব তৃষা, সে অমৃত ছেড়ে হলাহল ধরল।

"এমন করে আর চলে না, চিনু। পালিয়ে না গেলে আমি বাঁচব না। কিন্তু কার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে?" মিলি সত্যি সত্যি ও কথা মুখ ফুটে বলল।

বলল, "চিনু, লক্ষ্মীটি, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আজকেই।"

৪

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না চিনু। সত্যি ও কথা শুনেছে? না অন্য কোনো কথা?

ত্রস্ত চকিত চাউনি দিয়ে চিনু একবার দেখে নিল মিলিকে। কী রোগ? ডাক্তারী শাস্ত্রের সঙ্গে লক্ষণ মিলছে কি না? মেণ্টাল কেস নয় তো?

"মরার চেয়ে পালানো ভালো না পালানোর চেয়ে মরা ভালো, রাত দুটোর পর থেকে এই কেবল হানা দিচ্ছে মনে। একবার এটা, একবার ওটা। তুমি চলে গেলে দোটানা চলে

যাবে। তখন আর পালানো নয়। মরা।" মিলি বলল বিভোর হয়ে। বলল যেন ঘুমের ঘোরে।

চিন্ময়ের বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েছিল। ভাবছিল মেণ্টাল কেস ছাড়া আর কী হতে পারে? এমন কী ঘটেছে যার জন্যে সুস্থ সবল পূর্ণযৌবনা অবস্থাপন্ন গৃহিণী ও জননী হয় মরবে নয় পালাবে? এ কি সত্য? এ কি মায়া?

মিলির প্রলাপ সমানে চলছিল। "তার চেয়ে আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। তোমার তো স্ত্রী নেই যে আপত্তি করবে। তবে, হাঁ, ইনি আপত্তি করবেন বটে। তা করুন। আমি শুনব না। এখন তুমি একটু মনের জোর দেখালে হয়।"

মনের জোর দেখাবে কী! চিন্নু একেবারে জড়সড়। তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বাসব তোমাকে মারধোর করে?"

"না, মারধোর করবেন কেন?"

"তবে কি," চিন্নু ইতস্তত করে জানতে চাইল, "আর কাউকে ভালোবাসে?"

"কই, না, তেমন কিছু তো শুনিনি।"

"মদ খায়! রেস খেলে? ধারকর্জে ডুবে আছে?"

"না। না। সেসব কথা ঠিক নয়। সামাজিকতার খাতিরে এক আধ পেগ খেতে হয়। ওটা আমার গা সওয়া হয়ে গেছে।"

"তা হলে?" চিন্নুর প্রশ্নের রসদ ফুরিয়ে এলো।

"তা হলে?" মিলি বিষণ্ণ স্বরে বলল, "আমি কেন পালাতে চাই? এই তো? চাই এইজন্যে যে যার সঙ্গে আমার বিয়ে

হয়েছিল এ মানুষ সে মানুষ নয়। আমি পরপুরুষের সঙ্গে ঘর করছি বলে নিজের চোখে নিজে ছোট হয়ে যাচ্ছি। তিন মাস এখানে ছিলুম না। শান্তিতে ছিলুম। এবার আবার অশান্তি শুরু হলো। অশান্তিটা কোনখানে ধরতে পারছ না? পর-পুরুষের সঙ্গে থাকায়।"

চিনু শুধু এইটুকু ঠাহর করতে পারল যে কেসটা মেণ্টাল নয়, মরাল। ডাক্তার তার কী করতে পারে! সে অনেক ক্ষণ হতবাক থেকে তার পরে বলল, "আচ্ছা, ও যদি আবার সেই মানুষ হয়?"

"তার জন্যে চোদ্দ বছর অপেক্ষা করেছি। আর কত কাল করব? জীবনটা কি একজনের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি? বিয়ে বলতে কি এই বোঝায় একজনের জন্যে আরেক জন তার নিজের জীবনের সব সুখ, সব সাধ, সবটুকু প্রতিভা, সমস্ত আয়ু উৎসর্গ করবে? জীবনধারণের ধারা যেখানে এক জনের এক রকম, আরেক জনের আরেক রকম, সেখানে পৃথক জীবনই কি শ্রেয় নয়? না, চিনু, আমি আর অপেক্ষা করব না।"

"আচ্ছা, আমি ওকে বলব।"

"বলে কী ফল হবে, চিনু? জীবন বলতে আগে অনেক কিছু বোঝাত। এখন বোঝায় শুধু জীবিকা। তাও নয়। পদমর্যাদা। পদ যতই বাড়ছে ঘরের সঙ্গে বাইরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ততই বাড়ছে। তবু থামবে না। লোকের সঙ্গে মেলামেশা কমে আসছে, কেউ আসে না, যারা আসে তাদের একটা না একটা মতলব আছে। তবু শিখবে না। এমন

মানুষকে নিয়ে আমি করি কী? এর সঙ্গে বাস করা একান্ত নীরস। একটা দিনও কাটতে চায় না। চলে যদি যাই তো অমনি ফিরিয়ে আনার জন্যে সাধাসাধি। ফিরে যদি আসি তো অমনি ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসল, তোমার সঙ্গে দেখা না হলে শেয়ালদা থেকে পার্বতীপুর কথা কইবার সাথী পেতুম না। বাড়ী এলো তো ক্রিং ক্রিং। টেলিফোন। মন্ত্রীর জন্যে ব্রেকফাস্ট। খাওয়া শেষ হতে না হতে চলল ঘুমোতে। ভোর হতে না হতে চলল সৈদপুর।"

চিনু সহানুভূতি জানাল। বলল, "আচ্ছা, আমি ওকে বোঝাব।"

"মিসেস টমসনরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন আমি তাঁদের আয়ার স্বজাতি। কপালগুণে পুলিশ-সাহেবের বৌ হয়েছি। অথচ এঁরা না গেলে পার্টি জমবে না। অমন পার্টি দিতে যাও কেন? কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে? যদি য়্যাডিশনাল এস. পি. করে! করলে ক্ষতিটা কার? রাজ্যের না তোমার? তোমার ক্ষতি হয় তো তুমি ছুটি নিয়ে সরে পড়। তা হবে না। ছুটি নিলে অন্য লোক প্রমোশন পাবে, আমি পাব না।"

চিনু বলল, "আচ্ছা আমি ওকে ছুটি নিতে বাধ্য কবব।"

"ছুটি নিলেই বা হবে কী! সমস্তক্ষণ ফিরে আসার জন্যে ছটফট করবে। তুমি ওকে চেনো না, চিনু। ওর মন পড়ে থাকবে চাকরিতে, দেহ পড়ে থাকবে আমার কাছে। ওর চাকরি আমার সতীন। এ জীবনে আমার যে ক্ষতি হয়েছে তার

পূরণ হবে না, চিনু, যদি না ও আমাকে ছাড়ে আর নয়তো আমার সতীনকে ছাড়ে। চাকরি ছাড়লে ও বাঁচবে না, কাজেই আমাকেই ছেড়ে দিক, আমি বাঁচি। চিনু, তুমি এসেছ একটা সন্ধিক্ষণে।"

চিনু ভাবনায় পড়ল। বাসবের কাছে অমন প্রস্তাব করে কোন মুখে! বলল, "মিলি, চাকরি ছাড়তে হলে আরো আগে ছাড়া উচিত ছিল, যে বয়সে অন্য কোনো জীবিকায় প্রতিষ্ঠা সহজ। এখন যদি ছাড়ে ওর এ কূল ও কূল দু'কূল যাবে। ও তো আমার মতো ব্যাচলরও নয়, ডাক্তারও নয় যে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে পারবে। লোকটাকে কি তুমি মেরে ফেলতে চাও, মিলি! ওর দিকটাও ভেবে দেখো। সবুর করো, যত দিন না ওর পেনসন পাওনা হয়।"

"তা হলে আমাকেই মেরে ফেললে হয়। কবে ওর পেনসন পাওনা হবে, তত দিন যদি ও চাকরিতে পড়ে থাকে আর আমিও পড়ে থাকি ওর সঙ্গে তা হলে আমার প্রাণ বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। কেমন স্পিরিটেড মেয়ে ছিলুম আমি, জানতে তো সবই। সেই আমি এখন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি। না, চিনু, এমন করে বেঁচে থাকা যায় না। আমাকে যদি বাঁচতে হয় তবে আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

চিনু বলল, "আচ্ছা, তুমি একটা মহিলা সমিতি কি বালিকাবিদ্যালয় নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারো না? এসব কাজও তো করবার মতো কাজ। দেশও চায়।"

"আহা, কী নতুন কথাই না শোনালে! মহিলাসমিতিও

করেছি, বালিকাবিদ্যালয়ও করেছি। কিন্তু দেশের মেয়েদের মন পাইনি। ওদের ধারণা আমরা দেশের শত্রু, ইংরেজের চর। কী একটা গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মহিলা ও বালিকাদের হাত করছি। এদিকে মিসেস টমসন, ডিকসন, ওদিকে মিসেস উকিল, মোক্তার। বল, মা তারা, দাঁড়াই কোথা! কার সঙ্গে মিশব! কার সঙ্গে মিলব! মিলে মিশে কাজ করতে প্রাণ ব্যাকুল। কিন্তু যেখানে এত সন্দেহ সেখানে মেলামেশা কি সম্ভব!"

চিন্নু আর কী বলতে পারে! বলে, "মিলি, তুমি ছিলে চির আনন্দময়ী। তোমাকে এমন নিরানন্দ দেখব আশা করিনি। কাল ঘুম হয়নি বলে আজ তোমার মন ভালো নেই। যাও, একটু বিশ্রাম করোগে। তোমাকে আমি আনন্দময়ী দেখে যেতে চাই। তুমি আনন্দ দিয়ে যাও, মিলি। দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে যাও, বিলিয়ে দিয়ে যাও আনন্দ। সে ক্ষমতা থেকে কেউ তোমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আজ তুমি সেতার বাজাবে, আমি শুনব। বিদায়ের পূর্বে মনের পটে মুদ্রিত করে নেব তোমার আনন্দময়ী মূর্তি।"

"ধন্যবাদ। সেতার বাজাতে ভুলে গেছি। কে শুনবে, কার জন্যে বাজাব! নিজের আনন্দের জন্যে যত দিন পারি বাজিয়েছি। তার পর ছেড়ে দিয়েছি।"

চিন্নু উঠবে ভাবছিল। মিলি তাকে উঠতে দিল না। বলল, "যাকে তুমি দেখবে আশা করেছিলে সেই আমি তোমাকে দেখা দেব, কিন্তু এখানে নয়, অন্য কোনোখানে। সেখানে তুমি

আমাকে নিয়ে যাও, চিনু। এখানে আমি মরে যাচ্ছি, মরতে মরতে মরেই যাব এক দিন।”

“ছি! ওসব কথা ভাবতে নেই। চিন্তাকে অন্য ভাবে নিযুক্ত রাখ।”

“স্থান পরিবর্তন না হলে সেটা সম্ভব নয়।”

“বেশ তো। দার্জিলিং গিয়ে ছেলের সঙ্গে থাক।”

“ছেলে কতটুকু সময় আমার সঙ্গে থাকবে! তার জীবনে সে সঙ্গী খুঁজে নেবে অপরকে। আমি সঙ্গী পাব কোথায়!”

“তা হলে কলকাতায় গিয়ে একটা কাজটাজ জুটিয়ে নাও।”

“চেষ্টা করিনি, ভাবছ! আমি কে সে কথা শোনার পর কেউ আমাকে চাকরি দেবে না। বলবে, আপনাকে দিলে অভাবীদের দেব কী!”

চিনু ভাবনায় পড়ল। না, এর কোনো সরল সমাধান নেই। মানিয়ে নিতে হবে স্বামী-স্ত্রীকে। বাসবকে একটু নজর দিতে হবে ঘরের দিকে।

“কারা চাকরি দিতে রাজী, জানো!” মিলি বলতে লাগল। “যারা পুলিশের কাছ থেকে কোনো ফেভার চায়। তারা আমাকে দিয়ে আমার স্বামীকে বা আমাদের বন্ধু কোনো পুলিশ অফিসারকে পাকড়াবে।”

শুনে এত বিশ্রী লাগল চিনুর। সে বলল, “কাজ নেই চাকরি করে। তুমি যাও, কিছু দিন ছোট কাকিমার সঙ্গে থাক। তোমার একটা চেঞ্জ দরকার।”

এ হলো ডাক্তারের রায়। তবে চিন্নু ভিতরে ভিতরে তৈরি হতে থাকল বাসবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। চেঞ্জের পরে আবার তো একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হবে। সমস্যাটা নৈতিক।

কথাবার্তা তখনকার মতো তোলা রইল। চিন্নু উঠল। মিলি একা বসে রইল। গভীর ভাবনায় মগ্ন। চিন্নুর কথা ওর কানে যায়নি বোধ হয়।

টিফিনের আগে বাসব এসে পৌঁছল। গটমট করে বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে চিন্নুকে লক্ষ্য করে বলল, "কেল্লা ফতে। মিনিস্টার লোকটা সিনিস্টার নয়। আমার সিগরেট ধরিয়ে দিল নিজের হাতে। বার বার 'সার' বলে সম্বোধন করল। যাবার সময় বলল, আপনার সৌজন্য আমার মনে থাকবে, সার। কখনো দরকার হলে আমাকে একবার টেলিফোন করতে ভুলবেন না। আমি আপনার পরম অনুগত ভৃত্য।"

চিন্নু তারিফ করে বলল, "তবে আর কী! এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে মিলির সঙ্গে একটু গল্প করতে পারো। কিন্তু সরকারী বিষয়ে না।"

"আর কোনো বিষয় কি আমার জানা আছে ছাই!" বাসব মিলির খোঁজে বাড়ীর ভিতর ঢুকল।

৫

টিফিনের সময় মিলি খাবার ঘরে এলো না, মাথা ধরেছে বলে শুতে গেল। বাসব আর চিন্নু খেতে বসল। হেন তেন

নানা রকম কথাবার্তার পর চিনু আস্তে আস্তে সুতো ছাড়ল। অতি সন্তর্পণে। পাছে বাসব রেগে যায়।

"তোমাকে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, বাসব। একবার তোমাকে শুইয়ে এগজামিন করতে চাই। হাঁ, ব্লাডপ্রেসার তো বটেই! একটা থরো চেক-আপ।"

"কেন? কেন, বলো তো?"

"ডাক্তারকে অমন প্রশ্ন করতে নেই। আই নো মাই জব।"

"কিন্তু হঠাৎ এ রকম একটা প্রস্তাব—"

"আহা, তোমাকে কি আমি বাধ্য করছি? আমাকে বিশ্বাস না হয় রেলওয়ের চীফ মেডিকাল অফিসারকে কল দিতে পারো।"

"তোমাকে অবিশ্বাস করছি, কেন ভাবছ? কিন্তু হঠাৎ এমন একটা—"

"আচ্ছা, খাওয়া শেষ করো। অতটা উত্তেজিত হতে হবে না। এগজামিন আজ না করে কাল করলেও চলবে। অবশ্য আমি থাকব না।"

বাসব দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেল। "না, না, আজকেই।"

গম্ভীরভাবে রক্তের চাপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে চিনু বলল, "বাসব, আমি হলে এই মুহূর্তে ছুটির দরখাস্ত করে দিতুম পুরো আট মাস। চলে যেতুম ভিয়েনায় কি সুইটজারলণ্ডে। মিলিকেও নিয়ে যেতুম সঙ্গে। খরচের কথা ভাবতুম না।"

বাসব যেন আকাশ থেকে পড়ল। প্রথমে তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। যখন সরল তখন বলল, "ডিগবি ছুটি নিচ্ছে

সামনের মাসে। একটা ভেকেন্সী হবে। সেই চেনে যে আমি থাকব না তা কে বলতে পারে? এ সুযোগ যদি আমি হারাই তা হলে আমার নিচের লোক উপরে উঠে যাবে। তা যদি হয় তবে কে চায় বাঁচতে। বাঁচার জন্যেই তো ছুটি নিয়ে ভিয়েনা যাওয়া। আমাকে একটু বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারো।"

"তা তুমি বিষ বড় কম খাচ্ছ না। তোমার ডায়েট বদলাতে হবে।"

"বলো কী হে! ডায়েট যদি বদলাই তবে খাব কী! খুলে বলছ না কেন, রোগটা কী? ডায়েবিটিস?"

"এখন বলব না। তুমি একখানা দরখাস্ত লিখে আমার হাতে দাও, আমি যাই চীফ মেডিকাল অফিসারের কাছে। দু'জনে পরামর্শ করে গবর্নমেণ্টে পাঠাই।"

"আচ্ছা, পনেরো দিন ছুটি নিলে হয় না? দার্জিলিং গেলে হয় না?"

"ক্ষেপেছ? চিকিৎসা জিনিসটা ছেলেখেলা নয়।"

"কিন্তু কিসের চিকিৎসা? বেশ তো ভালো বোধ করছিলুম আমি, এই একটু আগে পর্যন্ত। এখন দেখছি বুক ধড়ফড় করছে। ব্যাপারটা কী হে? হার্ট?"

"হার্টকে অবহেলা করা সুবুদ্ধি নয়।"

"আমার মনে হয় নার্ভ।"

"নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটতে দেওয়া অবিবেচনার কাজ।"

"তা হলে কী করতে বলো? দরখাস্ত? বরাট প্রমোশন

পাবে, আমি সাক্ষীগোপাল হব? ওর রেকর্ড ভালো হবে, আমারটা খারাপ হবে?"

"বরাটের বরাত। ইউরোপ থেকে ঘুরে এলে তুমিও এক দিন বরাটের উপর টেক্কা দেবে। তা যদি না করো তো অক্কা পাবে।"

বাসব বিষম বিপদে পড়ল। একজন সিনিয়র আই. এম. এস. ডাক্তার তাকে ছুটির দরখাস্ত করতে বলছে। নিশ্চয় যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ওদিকে যে মোয়া গেল হাতছাড়া হয়ে। একবার রেকর্ড খারাপ হলে কি সহজে শোধরায়? কোন কোন পোস্টে অফিসিয়েট করেছ, এ প্রশ্ন যে দিন উঠবে সেদিন বরাট উত্তর দেবে কেমন বুক ফুলিয়ে। আর বর্মণ?

বাসবকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নেওয়া কি এক আধ ঘণ্টার কাজ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল ওর মাথায় হাত বুলোতে, পিঠে হাত বুলোতে। জিভটা আবার দেখতে হলো। আবার স্থেথোস্কোপ বসাতে হলো নানা জায়গায়। নাড়ী দেখতে হলো। চোখের পাতা ওলটাতে হলো।

"মাই ডিয়ার চ্যাপ," চিনু বলল ইংরেজীতে, "তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। আপাতত আট মাসের জন্যে সুপারিশ করছি, পরে আরো কয়েক মাস বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। টেক দি ফার্স্ট বোট হোম।" শেষেরটুকু সাহেবিয়ানা।

বাসব এর পরে সত্যি সত্যি অসুস্থ বোধ করল। কাতর-ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "জ্বর নেই তো?"

"হুঁ। স্লাইট টেম্পারেচার। ও কিছু নয়। তুমি এখনি দরখাস্ত করো। আমি তোমার জন্যে লিখে দিতে পারি।"

"না, আমার স্টেনোকে দিয়ে লেখাব। কোই হ্যায়? স্টেনোবাবুকো খবর দো। আচ্ছা, আপাতত চার মাস। পরে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

"ইউরোপ গেলে চার মাসে কী হবে?"

"চার মাসের বেশী হলে এ পোস্টটা বেহাত হবে যে।"

"হলোই বা! এটা এমন কী একটা পোস্ট।"

"প্রাইজ পোস্ট। তবে কাজ দেখাবার মতো নয়।"

"তাই তো বলছি। এর জন্যে ইউরোপের প্রোগ্রাম সংক্ষেপ কোরো না। যাও, গিয়ে আনন্দ করো। মিলিও যাবে। মিলিও আনন্দ করবে। তোমরা দু'জনে মিলে ভালোমন্দ খাবে, খোশ গল্প করবে, নাচবে, খেলবে। ওকে বলবে ওর সেতারটা সঙ্গে নিয়ে যেতে। বাজিয়ে শোনাতে। শুনতে খাসা লাগবে তোমার ঐ বিদেশে। ওকে বলবে ছবি আঁকতে, তোমার ছবি, তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ডের ছবি। তুমিও গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবে ওকে। ক্যামেরা দিয়ে ওর স্ন্যাপ-শট তুলবে।"

বাসব তার স্টেনোকে লিখতে বলল ছুটির দরখাস্ত। সাত পাঁচ ভেবে বসিয়ে দিল মাসের ঘরে ছয়। ডাক্তারকে ঠকাল। কাগজটা সই করে দিয়ে চিনুর হাতে দিয়ে বলল, "আর এ নিয়ে খুঁচিয়ো না আমাকে। ইউরোপের পক্ষে ছ'মাস যথেষ্ট।"

চিনু আর পীড়াপীড়ি করল না। পাছে বাসব তার মত

বদলায় সে কথা ভেবে কাগজটা লুকে নিয়ে পকেটে পূরল। চীফ মেডিকাল অফিসরকে ফোন করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল মোটরে। বাসবকে টেনে নিয়ে চলল।

ছুই ডাক্তারে মিলে ছোটখাট একটা মেডিকাল বোর্ড করে সুপারিশ করল অন্তত মাস ছয়েক ছুটি, ভারতের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোক ছুটল কলকাতায় চিঠি দিতে। ডাকঘরে চিঠি দিলে দেরি হতে পারে।

চায়ের সময় মিলির সঙ্গে দেখা। বাসব তখন মনের ছুঃখে বলল, "আমার ট্রেনের খুব বেশী দেরি নেই। মিলি, এবার তা হলে গোছগাছ করি। কাপড় ছাড়তে হবে আবার।"

"তুমি কি সত্যি যাচ্ছ আজ? আর একটা দিন থেকে গেলে হয় না?

"তার কি কোনো দরকার আছে, মিলি?"

"আমাকেও তো গোছগাছ করতে হবে।"

"কেন বলো তো?"

"যাবার জন্যে।

"তুমি যাবে কোথায়?"

"তুমি যেথায়।"

"সে কী! তুমি কি পাগল হলে!"

"তা তুমি যখন ওঁকে সার্টিফিকেট দিলে অসুখের আমাকে সার্টিফিকেট দাও পাগলামির। আর নিজে চিকিৎসার ভার নাও।"

চিন্নু এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বলল, "মিলি, তোমার বয়স উনিশ নয়। আমার নয় চব্বিশ। এ বয়সে রোমান্স করা মানায় না। তা ছাড়া তুমি আরেকজনের স্ত্রী। তার ছেলের মা।"

"কিন্তু ও যে সেই মানুষ নয়। আমি পরপুরুষের ঘর করছি।" মিলি বলল সম্পূর্ণ বেপরোয়া ভাবে।

"তা হলেও তোমার ছেলেমানুষী করা উচিত নয়। পরে যখন অনুতাপ করবে তখন কি ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে? তখন কী সর্বনাশ হবে, ভেবে দেখ।"

"ফিরে আসতে হবে কেন?"

"অনুতাপ করলে ফিরে আসতে হবে না?"

"অনুতাপ করি তো মরব, তবু ফিরব না।"

"ওটা হলো পাগলের মতো কথা। মিলি, ভেবে চিন্তে কাজ করো।"

"চিন্নু, ভাববার কী আছে? তোমার সঙ্গে যে এমন ভাবে দেখা হলো এর কি কোনো তাৎপর্য নেই? এটা কি একেবারেই আকস্মিক!"

"তা ছাড়া আর কী? পথে ঘাটে অমন কত হয়।"

"হয়, কিন্তু ঠিক যখন মানুষ চার দিকে অন্ধকার দেখছে সেই সঙ্কট ক্ষণে যদি অকস্মাৎ একটি আলোর রেখা চোখে পড়ে তা হলে তাকে অনুসরণ করাই মানুষের স্বভাব। তার ফল যদি খারাপও হয় তবু এর চেয়ে খারাপ হবে না।"

মিলিকে কোনোমতে তার সংকল্প থেকে টলানো গেল না।

চিন্নু হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু কী করে এটা সম্ভব। বাসব যদি রাজী না হয় তা হলে চুরি করে তো মিলিকে নিয়ে যেতে পারে না।

চিন্নু সে দিন যাওয়া স্থগিত রাখল। টেলিগ্রাম করতে হলো দ্বিতীয় বার। তার পর মিলির উপর ভার দিল বাসবের অনুমতি নেবার। কোন লজ্জায় সে নিজে ও কথা পাড়বে! এ ভাবে জড়িয়ে পড়তে হবে জানলে সে কি পার্বতীপুরে 'ব্রেক জার্নি' করত। এখন এর কী যে পরিণাম, কল্পনা করতে তার রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিল।

ওদিকে মিলি গিয়ে দেখল বাসব শুয়ে শুয়ে আফিসের ফাইল পড়ছে। রাশি রাশি ফাইল পাশের খাটে জড় হয়েছে। শোবার ঘরটাকেই আফিস ঘর করে তোলার চেষ্টা।

"তা হলে আমি শোব কোথায়?" সুধালো মিলি।

"কেন? চিন্নু আজ যাচ্ছে না? ও ঘরটা খালি হচ্ছে না?" সুধালো বাসব।

"না, চিন্নু আজকের দিনটা থেকে যাচ্ছে। কাল আমরা এক সঙ্গে যাব।"

৬

বাসব অন্যমনস্ক ছিল, ঠিক ধরতে পারল না কথাটা। বলল, "হাঁ, একসঙ্গেই যাব আমরা ওকে পার্বতীপুরে তুলে দিতে।"

"না, আমরা মানে তুমি-আমি নয়। আমরা মানে চিন্নু-আমি।"

বাসব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। এর অর্থ?

"বুঝতে পারলে না? চিনু আর আমি একসঙ্গে যাচ্ছি গৌহাটী। তুমি যদি ছুটি পাও তবে একাই বিলেত যেয়ো।"

হতভম্ব হয়ে বাসব বলল, "একাই?"

"কেন? একাই তো গেছলে পার্বতীপুর আজ ভোরে। ভয় নেই। ওদেশে তোমাকে সঙ্গ দিতে অনেক মিসেস টমসন ডিকসন জুটবে। তুমি গোটাকয়েক পরিচয়পত্র যোগাড় করে নিয়ে যেয়ো। তোমার সুখী হওয়া উচিত যে আমি থাকব না রসভঙ্গ করতে।"

এত ক্ষণে বাসবের হুঁশ হলো যে মিলি রাগ করেছে। উঠে বসে বলল, "মিলি, তোমার মনে কষ্ট হবে জানলে কি আমি ওদের নিয়ে যেতুম? আর তোমার ইচ্ছে ছিল জানলে কি আমি তোমায় নিয়ে যেতুম না?"

"আমার ইচ্ছা ছিল না যেতে। নো পার্ট অফ মাই ডিউটি। তোমার ইচ্ছা ছিল। পার্ট অফ ইওর ডিউটি। এখন কথা হচ্ছে এই। তোমার ডিউটি আর আমার ডিউটি যদি এক না হয়, যদি তাদের মধ্যে সঙ্গতি না থাকে, সামঞ্জস্য না থাকে, তা হলে তুমি আমি কেন একসঙ্গে থাকি?"

বাসব অপ্রতিভ হয়ে বলল, "কেন একসঙ্গে থাকি?"

"হাঁ। কেন? বিয়ে হয়েছে বলে সারাজীবন এক জোয়ালে জোতা থাকতে হবে? তুমি যেদিকে টানবে আমি টানের জোরে সেই দিকে যাব? ধরো, আমি যদি আরেক দিকে টানি? তুমি টানের জোরে আসবে সেদিকে? এই তো

আমি কাল আসামের দিকে টানছি। দেখি তুমি আমার টানের জোর সামলাতে পারো কি না?"

বাসবের টনক নড়ল। সেই এত দিন টেনে এসেছে। এবার তাকে নাকে দড়ি দিয়ে টানা হবে।

"বেশ, তা হলে তাই হোক। চাকরিটা যাক। স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ফকিরের মতো ঘুরি। ছেলেটা ফুটপাথে বসে ভিক্ষা করুক।" বাসব কপালে হাত দিল।

"চাকরিটা গেলে তুমি সামনের মাসে ডেপুটি কমিশনার হবে কী করে? এই যে আজ এত তদ্বির করে এলে এটা কি আজ মাঠে মারা যাবে?"

"তদ্বির! আমি!" বাসব বিস্মিত হয়ে বলল, "আমি করব তদ্বির!"

"তবে অমন মরি কি পড়ি করে ছুটলে কেন? কী করতে? ওটা কি তোমার ডিউটি? যদি ডিউটি হয়ে থাকে তবে তুমি চাকরিই করে যাও সারাজীবন। কেবল আমাকে ছাড়পত্র দাও। আমি চলে যাই যেদিকে দু'চোখ যায়। তোমার চেয়ে আমাকে কেউ ভালোবাসে না মনে করেছ? এই যে চিনু এ আমার ছেলেবেলার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর রাখে, বলছিল আমাকে কাল রাত্রে। কত কাল পরে দেখা, এই প্রথম দেখা, তবু সে যা জানে তা তুমিও জানো না, জানতে চাওনি, চাইবেও না কোনো দিন যদি তোমার সঙ্গে আরো চোদ্দ বছর কাটাই। তুমি জানো চোরডাকাতের জীবনের খুঁটিনাটি খবর।"

বাসব অপ্রতিভ হয়ে বলল, "তুমি যদি না বলো আমি জানব কী করে ?"

"আমি কি বলতে গেছি চিনুকে ? কোনো দিন দেখেছি ওকে ? ও আমাকে ভালোবাসে বলেই যেমন করে হোক জেনেছে। শুনলে বিশ্বাস করবে না ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। এমন আহাম্মক যে আমাকে জানায়নি। আমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে আর কাউকে বিয়েই করল না এ জীবনে।"

"য়্যাঁ!" বাসব অবাক হলো শুনে। যখন বাক্‌শক্তি ফিরল তখন বলল, "ওর একটা বিয়ে টিয়ে দাও। তুমি তো ওর বৌ হতে পারবে না।"

"কেন পারব না ? তুমি আমাকে ছাড়পত্র দিলে আমি ওকে ওর অপেক্ষার পুরস্কার দেব। কাল যদি আমি ওর সঙ্গে পালিয়ে যাই তা হলে সেই অজুহাতে তুমি আমাকে ডাইভোর্স করবে। করবে কি না বলো ?"

"য়্যাঁ!" আবার অবাক হলো বাসব। এবার বাক্‌শক্তি খুঁজে পেলো না।

"করবে। করবে। আমি জানি।" মিলি বলল ঈষৎ হেসে।

"ছাই জানো। হিন্দু আইনে ওসব থাকলে তো ?" বাসব ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করবে। তোমার তো সর্বনাশ হবেই, আমারও প্রমোশন বন্ধ। সেটাও এক হিসাবে সর্বনাশ। পুরুষের জীবনে যদি উন্নতি না থাকল

তবে কী থাকল ? পুরুষ বাঁচে আর দশটা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর পাঞ্জা কষে। বরাট, আহ্‌মদ, নেলসন এরা একে একে মিছিলের মতো এগিয়ে যাবে আমাকে মাড়িয়ে, আমাকে পা দিয়ে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে। একটা জীবন্ত শবের মতো পড়ে থাকব আমি। বুকের উপর কালীর মতো নাচতে থাকবে তুমি। লজ্জা শরম সব খুইয়ে থাকবে। মুখখানা আরো এক পোঁচ কালো হয়ে থাকবে। চিন্নুর তত দিনে শখ মিটে গিয়ে থাকবে।”

এর পরে দু'জনের রীতিমতো ঝগড়া বেধে গেল।

ডিনারের সময় যখন তিনজনের দেখা হলো বাসব বলল, “চিন্নু, মিলিকে তুমি নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও।”

এবার অবাক হবার পালা চিন্নুর। “সে কী, বাসব! আমি কেন চাইব! আমি কেন নিয়ে যাব!”

“আহা! না হয় মিলিই চাইছে। মিলিই নিয়ে যাক তোমাকে গৌহাটী।”

“তাই বা কেন হবে ? তুমি ওর স্বামী না ?”

“আইনে তাই বলে বটে। কিন্তু আইনে আবার এ কথাও বলে যে আমি ওর গায়ে হাত দিতে পারব না, দিলে পীনাল কোডের আমলে আসব। ওকে ধরে রাখতে পারব না, রাখলে পীনাল কোড। বার করে দিলে ও খোরপোষ দাবী করবে, তার মানে ক্রিমিনাল প্রোসিডিওর কোড। হিন্দু আইনে ডিভোর্স নেই, কাজেই ও যা খুশি করতে পারে, আমি কেবল করতে পারি আর একটা কি একশোটা বিয়ে। তাতে

ওর কী! আমারই মুশকিল। এ কালে একটার বেশী স্ত্রী পুষতে পারে ক'জন!"

চিনু সমবেদনা জানিয়ে বলল, "সত্যি, আইন আমাদের হাত পা বেঁধে রেখেছে। কিন্তু তুমি আইনের কথা ভাবছ কেন? হৃদয় বলেও তো একটা কিছু আছে। হৃদয়ের দিক থেকেও কি তুমি ওর স্বামী নও?"

"হৃদয়!" মিলি কণ্ঠক্ষেপ করে বলল, "হৃদয় জিনিসটা ওঁর পক্ষে বাহুল্য।"

"হৃদয়!" বাসব চিন্তা করে বলল, "কী জানি কোনো দিন ভাবিনি। আমি পুলিশের কাজ করি। ও কাজে হৃদয় আর বিবেক এ দুটি থাকতে প্রমোশন নেই।"

"নাই বা হলো প্রমোশন। তোমার চাকরি তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।"

"চাকরি কেড়ে নিচ্ছে না তা ঠিক। কিন্তু চাকরি করা অসম্ভব করে তুলছে। আমি না হয় প্রমোশন পেলুম না, আমার নিচের লোক তো পেলো। ডিঙিয়ে গেল তো আমাকে। হলো তো আমার উপরওয়ালা। যারা সুপারসীডেড হয়েছে তাদের চেহারা দেখলে তোমার চোখে জল আসবে। যেন পিঁজরাপোলের গোরু। এই মিলিটার যদি একটু দয়ামায়া থাকত তার স্বামীটার জন্যে!" বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলল বাসব।

"এ কী নতুন রঙ্গ শুরু হলো!" মিলি বিচলিত হয়ে বলল, "তোমার কান্নাকাটি দেখে আমি অমনি গলে যাব! তেমন

মেয়ে আমি নই। ঐ চিনু জানে কেমন ডানপিটে দুরন্ত মেয়ে ছিলুম। ডাকু মেয়ে।”

“থাক, মিলি। ওর অনেক দুঃখ।” চিনু বলল দরদীর মতো।

“মিলি বলছে আমি নাকি তোমার মতো ভালোবাসিনে।” বাসব বলল। “কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে তুমি যে ওর জন্যে তোমার জীবনের উন্নতি বিসর্জন দিতে এতটা আমি বিশ্বাস করব না, চিনু। আগে উন্নতি, তার পরে ভালোবাসা।”

চিনু কী বলতে যাচ্ছিল, তার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে মিলি বলল, “ব্যস্! এই যখন তোমার শেষ কথা তখন আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। তোমার ঘরে ফিরে এলে তো তুমি আমাকে নিয়ে ফাঁপরে পড়বে। আমি দিব্যি করছি আর ফিরে আসব না।”

“কী! এত বড় কথা!” গর্জে উঠল বাসব। এই বার নিজ মূর্তি।

“মারবে নাকি? মারো।” তেমনি ঝাঁজিয়ে উঠল মিলি।

চিনু বসেছিল দু'জনের মধ্যিখানে। হাঁ হাঁ করে দুই হাত দিয়ে দু'জনাকে রুখল। খানসামা বেয়ারা সকলেই তটস্থ। কী যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে। ঝড়ের পূর্বাভাস। খুন কি আত্মহত্যা কি আর কিছু।

“কোই হ্যায়?” বাসবের হাঁক শুনে আরদালী ছুটে এসে সেলাম ঠুকল।

"কলম লে আও। কাগজ লে আও। লেফাফা লে আও। টিকট লে আও। জরুর।" বাসব হুকুম করল হুঙ্কার ছেড়ে।

কাগজ এলো। কলম এলো। খাম এলো। ডাক টিকিট এলো। তখন হাতের ইশারা করে চাকরবাকরদের সরিয়ে দিল বাসব। মিলির দিকে চেয়ে বলল, "কী লিখতে হবে, বলো। ছাড়পত্র?" তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে।

মিলির মুখ শুকিয়ে গেছে। সে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল।

চিনু বাসবের হাতটা ধরে বলল, "আরে, না, না। ক্ষেপেছ?"

"হাত ছাড়ো।" বলে হাত ছাড়িয়ে নিল বাসব। তার পরে কী যে লিখে গেল এক মনে। কাউকে দেখতে দিল না। পড়ে শোনাল না। খামে ভরে টিকিট সেঁটে উপরে লিখল, "চীফ সেক্রেটারি, গবর্নমেণ্ট অফ বেঙ্গল।"

খামটাকে মিলির দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "এই নাও তোমার ছাড়পত্র। যাও, স্টেশনে গিয়ে আর. এম. এস.-এ দিয়ে এসো। চিনু, তুমিও যেতে পারো ওর সঙ্গে।"

সামনে ভেরমুথ ছিল। চিনুকে অফার করে গলাটা ভিজিয়ে নিল বাসব।

মিলি তখনো বিমূঢ় ভাবে বসে। চিনু ঠিকানাটা লক্ষ্য করেছিল। জিজ্ঞাসু ভাবে তাকালো। বাসবের মুখ তখন

মড়ার মতো শাদা। তারই উপর অতি কষ্টে হাসির আমেজ ফুটিয়ে বাসব বলল ধরা গলায়, "ওঃ! চীফ সেক্রেটারিকে কেন লিখেছি, ভাবছ? ছাড়পত্র দিতে হলে আমরা শ্বশুর-বংশকেই সংবাদ দিই। বলি, শ্রীমতী চাকুরি সুন্দরী দেবীকে ছাড়পত্র দিলুম। নিতে আজ্ঞা হয়"

(১৯৫৪)

এই যদি ছিল মনে

জয়দেবকে টাঙ্গায় তুলে দিতে গিয়ে কুমকুম বলল, "আবার আসবেন।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" পড়ে যেতে যেতে গদি আঁকড়ে ধরে জয়দেব বলল, "যত দিন বাঁচি, আসবই, বৌদি। একটু মনে রাখবেন।"

সমীরণ চলল সেই টাঙ্গাতেই বন্ধুকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে। রাজা কী মাণ্ডি। সেখানেও সেই একই দৃশ্য।

"আবার এসো।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" জয়দেব কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত রেখে বলল, "গুড বাই নয়। ফরাসীরা যেমন বলে, অ রিভোয়া।"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরল সমীরণ। টাঙ্গায় নয়, পায়ে হেঁটে। আধ মাইল পথ। বেশী ক্ষণ লাগে না, তবু একটু বেশী ক্ষণই লাগল। বন্ধুর কথা ভাবছিল।

"তোমার বন্ধুকে এবার এতটা কাহিল দেখব আশা করিনি", বলল কুমকুম।

"আমিও আশা করিনি।"

"কী হয়েছে ওঁর? বয়স তো মাত্র তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশ।"

"কেমন করে বলব ? তবে লক্ষণ দেখে মনে হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন।"

"কই, এক বছর আগে তো এমনটি দেখিনি।"

"না। সেবার ওকে বেশ সুস্থই মনে হয়েছিল। তবে ওর কথাবার্তায় কেমন একটা অশান্ত ভাব লক্ষ্য করেছিলুম। এবার ওর কথাবার্তায় বাঁধুনি নেই। কেমন একটা ঢিলে ঢালা ভাব। লক্ষ্য করলে তো, 'যতদিন বাঁচি'।"

"হুঁ। 'একটু মনে রাখবেন'। বাপ রে, বিরাট বড়লোক! এক কলকাতা শহরেই চার পাঁচখানা বাড়ী। অগুন্তি চা বাগান। তাঁকে একটু দয়া করে মনে রাখব কিনা আমি, আধখানা ভাড়াটে বাড়ীতে যার অর্ধেক জীবন কেটে গেল।"

সমীরণ আহত হয়ে বলল, "তবু তো শস্তায় আছো। দিল্লী হলে কী করতে ? এই টাকায় এর চেয়ে আরাম একমাত্র আগ্রাতেই সম্ভব।"

কথাটা ঘুরিয়ে দিতে গিয়ে কুমকুম বলল, "আমি বলছিলুম কি ওঁর অগাধ টাকা। চিকিৎসা করালে সেরে যাবে।"

"ঐখানে তোমার ভুল, কুমু। ঐখানে তোমার ভুল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা গরিব, কিন্তু দুঃখী নই। আর আমার বন্ধু জয়দেব গরিব নয়, কিন্তু দুঃখী।"

"কেন ? দুঃখ কিসের ? তোমার মতো হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয় না। একটিও সন্তান হয়নি, বৌ মরে গেছে অল্প বয়সে। তারপর থেকে আজ হিল্লী কাল দিল্লী করে বেড়ানো হচ্ছে। নিষ্কর্মার ধাড়ী। সম্পত্তিগুলো যে দেখাশুনা করবে

সেটুকুও উত্তম নেই। তুমি বলছ, দুঃখী। আমি দেখছি সুখী?"

সমীরণ তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সুখ কিসে আর দুঃখ কিসে তা কি তুমি জানো না, কুমু? এই যে আমরা আমাদের চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একসঙ্গে আছি, তুমি নারী আর আমি পুরুষ, এই যে আমরা এখনো তেমনি ভালোবাসি, তুমি প্রিয়া আর আমি প্রিয়, এরই নাম সুখ। আর ঐ যে ও বেচারা টাকার জন্যে বিয়ে করে টাকা নিয়ে বসে আছে, বিয়ে গেছে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে, একটা ছেলে কি মেয়ে নেই যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে, একটা কাজও নেই যে স্নেহ-প্রেমের অভাব ভুলিয়ে রাখবে, ওরই নাম দুঃখ। তোমাকে যদি কেউ জয়দেবের ভাগ্য দিয়ে এ ভাগ্য কেড়ে নিত তুমি সুখী হতে?"

"ষাট। ষাট। তোমার মুখে কিচ্ছু আটকায় না," বলে কুমকুম স্বামীর মুখে হাত চাপা দিল। মধুর হেসে বলল, "লাখ টাকার বদলে অমন ভাগ্য চাইনে।"

সমীরণ তখনো ভাবছিল বন্ধুর কথা। "তা কি জয়দেব জানত! কতটুকু দূরদৃষ্টি মানুষের! নিয়তি তাকে টোপ দিয়ে বঁড়শিতে গাঁথে। সে মাছের মতো লোভে পড়ে, মাছের মতো মরে। জয়দেবকে বাঁচাতে হবে।"

"হাঁ। সুচিকিৎসা চাই। তুমি একটা ব্যবস্থা করো।"

"ও কথা ভেবে বলিনি। এ কি দেহের রোগ যে চিকিৎসায় সারবে!"

কুমকুম বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, "তা হলে ওঁর একটা বিয়ে দাও। এখনো দাম্পত্য সুখ সন্তান সুখ হতে পারে।"

"কিন্তু," সমীরণ গম্ভীরভাবে বলল, "ব্যাপার অত সোজা নয়। প্রত্যেক বছর ও তাজমহল দেখতে আসে, আমাকে টেনে নিয়ে যায় ওর সঙ্গে। দুই বন্ধুতে অনেক ক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি তাজমহলের দিকে চেয়ে। তার পর কথা বলি। জানতে চাই আমি, ও কি ওর মমতাজের জন্যে এখনো বিরহ বোধ করছে? ওর ব্যাথার কি অবসান নেই? ও উত্তর দেয়, বিরহবোধ অসাড় হয়ে গেছে। তাজমহল দেখে আবার জাগে কি না পরখ করার জন্যেই আসে। জাগে না। তখন জিজ্ঞাসা করি, আবার বিয়ে করতে বাধা কী? বলে, বাধা অন্য ধরনের। স্মৃতি যদিও স্মৃতি হয়ে গেছে তার বিয়ের পণযৌতুক তো স্মৃতি হয়ে যায়নি। আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করলে স্মৃতির পিতার দান ভোগ করা উচিত হবে না। ওটা দুর্নীতি। অথচ বাড়ী-গুলো, চা বাগানগুলো ফিরিয়ে দিলে ওর চলবে কী করে, স্ত্রীকে পুষবে কী করে?"

কুমকুম বিরক্ত হয়ে বলল, "নিজেরও তো ঘটে বিদ্যাবুদ্ধি আছে। অক্স্ফোর্ডের ডি. লিট.। ওঁর মতো ডিগ্রী থাকলে তোমাকে লেকচারার হয়ে পড়ে থাকতে হতো না। প্রোফেসর কি রীডার হতে।"

সমীরণ করুণ হেসে বলল, "ঐখানে তো গোল। আমি কলকাতার এম. এ. বলে আমার মানহানি হয় না, আমি যেখানে হোক একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারি। কিন্তু ও

যে নামকরা বিদ্বান, অক্স্‌ফোর্ডের ডি. লিট.। ও যদি আমার মতো লেকচারার হয় তা হলে ওর মান সম্ভ্রম থাকবে না। ওকে তখন ধুতীপাঞ্জাবী পরতে হবে, হাত দিয়ে খেতে হবে, কেউ টের পাবে না যে বিলেতফেরত বড় সাহেব।"

"তাতে কি হয়েছে?"

"এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই তুমি ও কথা বলতে পারলে। তখনকার দিনে ওর মতো লোকের পক্ষে মান সম্ভ্রম বজায় রাখা একটা জীবন মরণের প্রশ্ন ছিল। বড় চাকরি ওর পাওনা, কিন্তু গবর্নমেণ্ট তা দেবে না। কারণ ও ভারতীয়। ওর চেয়ে যারা নিকৃষ্ট তারা ইংলণ্ডে জন্মেছে বলে ওর পাওনা কেড়ে নেবে। এর প্রতিবাদে ও ছোট চাকরি নেবেই না। দেশী স্টাইলে থাকলে গবর্ণমেণ্ট বলত, তা তুমি তো শস্তায় চালাতে পারো দেখছি, তোমার অত মাইনের দরকার কী? তাই ও বিলিতী স্টাইলে থাকবে। এটাও প্রতিবাদ।"

কুমকুম বলল, "অদ্ভুত লোক তো!"

"তখকার দিনে ওটা অদ্ভুত ঠেকত না। মনে হতো, আমরা শস্তায় থাকি বলে আমাদের বেতন কম, বড় বড় চাকরিগুলো আমাদের দিলে বেতনও কমতে কমতে ছোট চাকরির মতো হবে। তার চেয়ে বড় চাকরির উপর দাবী রেখে বেশী খরচে থাকা ভালো।"

কুমকুম কিছুতেই সমর্থন করতে পারল না। সমীরণ হেসে বলল, "আমি আমার বন্ধুর যুক্তিটাই পেশ করছি। আমার

যুক্তি নয়। ও রকম যার যুক্তি সে মনের মতো কাজ না পেলে কাজ করবেই না। বাপের অন্ন ধ্বংস করবে ক্যালকাটা ক্লাবে ঘর নিয়ে, আস্তানা গেড়ে। বছরের পর বছর কাটিয়ে দেবে সুদিনের আশায়।"

"তা হলে ওঁর মাথা তখন থেকেই খারাপ।"

"তাই যদি হতো ও অত বড় সম্পত্তির মালিক হয়ে বসত না। ক্যালকাটা ক্লাবে সকলের সঙ্গে ওর আলাপ। তাঁদের একজনের ওকে ভালো লেগে গেল। মেয়ের বিয়ে দিলেন ওর সঙ্গে। তখন আর কী! রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব। চাকরির কথা আর কে ভাবে! স্ত্রীকে ভালোবাসাই ওর চাকরি।"

কুমকুম চিমটি কেটে বলল, "এটা তোমার বানানো।"

সমীরণ বৌকে একটু আদর করে বলল, "তখনো আমার বিয়ে হয়নি। আমি তখন নেপাল রাজ্যে কোনো মতে একটা চাকরি জুটিয়েছি। জয়দেবের বিয়ের খবর পেয়ে ভাবছি, আহা, আমার যদি অমন একটি শ্বশুর মিলে যেত! তা হলে কি আর পরের চাকরি করি! ঘরের চাকরিতেই লক্ষ্মী।"

কুমকুম মাথা নেড়ে বলল, "কক্ষনো না। তুমি কক্ষনো ও কাজ করতে না।"

"কী জানি! তোমার বাবার যদি জলপাইগুড়ি জেলায় চা বাগান থাকত আর তিনি যদি ওগুলোর অর্ধেক শেয়ার আমার নামে লিখে দিতেন তা হলে কি আমি এই সুদূর প্রবাসে লেকচারার হয়ে জীবনপাত করতুম! বলা যায় না।"

"খুব বলা যায়।" কুমকুম কঠোর হয়ে বলল, "তুমি এই-খানেই থাকতে, এই বাড়ীতেই, আর আমাকে একটা রাঁধুনী রাখতে দিতে না। তুমি দিলেও আমি রাজী হতুম না। আরেক রকম মান সম্ভ্রম আছে জয়দেববাবু তার ধার ধারেন না।"

সমীরণ খুশি হয়ে কুমকুমের হাত মুখে ছুঁইয়ে বলল, "তখনকার দিনে মনে হতো জয়দেব জিতে গেছে, আমি হেরে গেছি। এখন মনে হচ্ছে কী, বলব?"

"থাক, মিথ্যে কথা বলতে হবে না।" কুমকুম হাত সরিয়ে নিল। তার চোখে মুখে আনন্দের ছটা। "তারপর?"

"তারপর জয়দেব সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতে লাগল। কলকাতার অভিজাত মহলের সব ক'টা দরজা তার কাছে খুলে গেল। আজ গবর্নমেণ্ট হাউসে লাঞ্চন, কাল সার রাজেনের সঙ্গে ডিনার, পরশু বর্ধমান হাউসে ফ্যান্সী ড্রেস। স্ত্রীভাগ্যে ধন। ধন অনুসারে সম্মান। জয়দেব প্রাণপণে সতীসেবা করল। আমি তো তার সিকির সিকিও করিনি।"

"কেন করবে? আমার বিয়েতে কী পেয়েছ যে করবে?" ক্ষুব্ধ হলো কুমকুম।

"অমনি অভিমান করা হলো! আগে শোনই না সবটা।" এর পরে সমীরণ বলল জয়দেবের দুর্ভাগ্যের কথা। কর্মসংস্থানের জন্যে তার যেটুকু উদ্যোগ ছিল সেটুকুও চলে গেল। সে যে একজন কর্মপ্রার্থী সরকারী মহল, বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, কোথাও কেউ মনে রাখল না, শ্বশুরের পার্টনার বলেই সে পরিচয়

দিতে ও পেতে থাকল। কয়েক বছর পরে দেখা গেল সে অকর্মণ্য। অক্সফোর্ডের পাঠ বেবাক ভুলে গেছে। শত্রুরা রটায় ঘোড়ার ডাক্তার। অশ্বচিকিৎসার জন্যে তার কাছে কল্ আসে।”

কুমকুম খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তে যায়।

“তারপরে একদিন আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্মৃতি মারা যায়। জয়দেব দেওয়ানা হয়ে মহাদেবের মতো ঘুরে বেড়ায়। সেই যে ওর ঘোরা রোগ শুরু হলো বারো বছরেও সারল না। আবার ওকে সংসারী করার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। এমন কি শ্বশুরের তরফ থেকেও। তিনি ওকে সত্যি স্নেহ করতেন। কিন্তু ও আর ওমুখো হবে না।”

কুমকুম অভিভূত হয়েছিল। অনেক ক্ষণ নীরব থেকে বলল, “সামনে আরো দুর্ভোগ আছে। যদি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয় কে ওঁর সেবা করবে! নার্সকে দিয়ে আর কি সেবা হয়! নার্স করে শুশ্রূষা। বেশ বোঝা যাচ্ছে উনি আর বইতে পারছেন না ওঁর নিঃসঙ্গতা। ওঁর আবার বিয়ে করাই উচিত আর যখন বিরহবোধ নেই বলছ।”

“হাঁ, কিন্তু বিয়ে করলে খাবে কী, খাওয়াবে কী? শ্বশুরের সম্পত্তি তো ভোগ করতে অনিচ্ছা। এদিকে চাকরির বাজারে আরো তো অক্সফোর্ডের ডি. লিট. দেখা দিয়েছে। তাদের চাকরি না দিয়ে কে ওকে চাকরি দেবে? ও তো অধ্যাপনার অযোগ্য। ওর চেয়ে আমার বাজারদর বেশী।” সমীরণ সগর্বে তাকায়।

"কিন্তু শ্বশুরের সম্পত্তি যাকে বলছ তা তো এখন ওঁরই সম্পত্তি। শ্বশুর তো চিরকালের মতো দিয়েই দিয়েছেন। কেই বা কেড়ে নিচ্ছে যে ওঁকে চাকরি করতে হবে।"

"ঠিক। কিন্তু এটাও বেঠিক নয় যে প্রথম স্ত্রীর দৌলতে যা পেয়েছিল তা দ্বিতীয় স্ত্রীকে দিলে বেইমানি হবে। তোমার মতো উঁচু দরের মেয়েরা কখনো তা ছোঁবে না। বলবে, যাও, ফিরিয়ে দাও। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করো। যেমন তেমন মেয়েকে বিয়ে করতে ওর আপত্তি আছে।"

কুমকুম চিন্তিত হয়ে বলল, "তা হলে ওঁর সমস্যার সমাধান কী?"

"আমার মতে," সমীরণ বিচক্ষণের মতো বলল, "ওর এখন যে কোনো একটা কাজ নেওয়া উচিত, যে কোনো বেতনে। কাজ করতে করতে ও কাজের যোগ্য হবে। নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়ানো একটা অভিশাপ। ওয়ার্ক থেরাপি ওর চিকিৎসার পদ্ধতি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলার মতো কল্যাণ আর নেই। কপালের ঘর্মে অন্ন অর্জন করো যীশুখ্রীস্টের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শ্রমের অন্ন খেতেও মিষ্টি লাগে। গবর্নমেণ্ট হাউসের লাঞ্চনের চেয়ে।"

কুমকুম গালে হাত দিয়ে বলল, "এই যদি মনে ছিল তবে অক্সফোর্ড যাওয়া কেন, এত কষ্ট করে ডি. লিট. পাওয়া কেন, বড় চাকরি না জুটলে চাকরি করব না এই ধনুর্ভঙ্গ পণ কেন, ডিগ্রী ভাঙিয়ে বিয়ে কেন, স্ত্রীর টাকায় আয়েস কেন, সম্পত্তি ত্যাগ করার কল্পনা কেন? এমন অবধূতকে কোন

মেয়ে বিয়ে করতে মন থেকে রাজী হবে? ওয়ার্ক থেরাপি ছাড়া আর একটা থেরাপি আছে। তা না হলে কি ওঁর অসুখ সারবে!"

২

রূপকথায় আছে, রাজার ছেলে আর রাখাল ছেলে, দু'জনায় গলায় গলায় ভাব। এও কতকটা তেমনি। বড় হয়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও রাজার ছেলে নয় জয়দেব, রাজার জামাই। আর রাখাল ছেলে নয় সমীরণ, ছেলের রাখাল।

সমীরণ অনেক চেষ্টা করল জয়দেবকে কোনো একটা কাজে লাগাতে। সে ধরাছোঁয়া দিল না। এক নম্বর কুড়ের বাদশা। একটা না একটা ছুতো ধরে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেবে। যেন গরজটা তার নয়, কর্মদাতার। তার ধারণা সারা ভারতে যেখানে যত কর্মদাতা আছে সকলে তার শ্বশুরের মতো উপযাচক হয়ে তাকে ধরে বেঁধে আপিসের বেদীতে বসিয়ে দিয়ে বলবে, তুভ্যমহং সম্প্রদদে। সে দয়া করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, গৃহ্লামি।

"কেন, ওরা কী জানে না যে আমি যোগ্য পাত্র? আমিই যোগ্যতম পাত্র? কে না জানে ভূভারতে আমার নাম?" এই হলো তার জিজ্ঞাসা। তথা অভিযোগ।

এর উত্তরে সমীরণ লেখে, "সব সত্যি। তা হলেও একটা দরখাস্ত করতে হয়।"

সে দরখাস্ত করবে না। তার দাবী আগেকার দিনে যা ছিল আজকের দিনেও তাই থাকবে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে তাকে ধুতি পরে কলেজে পড়াতে হবে? বিশেষ যখন ছাত্ররাই কোট প্যাণ্ট পরছে?

দিল্লীতে ওর জন্যে তদ্বির করতে হলো। যাতে ওকে পররাষ্ট্রবিভাগে নিযুক্ত করে দক্ষিণ আমেরিকায় বা তিব্বতে চালান দেওয়া যায়। বলিভিয়াতে ওকে কন্সাল করার কথা উঠেছিল। কিন্তু ও নিজেই ভাঙ্‌চি দেয়। স্প্যানিশ ভাষা ও শিখবে না। ওকে একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দিতে হবে। যে দোভাষীর কাজ করবে।

আসলে ও বাবু হয়ে গেছে। খাটবে না। খাটতে অক্ষম। ওর জন্যে আরেক জন খাটবে। তাও যদি আরেক জনকে খাটিয়ে নিতে জানত। পরের উপর ছেড়ে দিয়ে ভেসে বেড়ানো ওর দ্বিতীয় প্রকৃতি। সরকারী চাকরিতে ও খাপ খাবে কী করে! বে-সরকারী চাকরিতেও বাবুয়ানা চলে না। বাইরে সাহেবিয়ানা, ভিতরে বাবুয়ানা, এই দস্তুর ও এই ধাত নিয়ে কোথাও কর্মপ্রাপ্তির আশা নেই। বেচারা জয়দেব!

ওর শ্বশুর ওকে পলিটিক্‌সে নামতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পার্টি ফাণ্ডে টাকা ঢালতে পারলে কিছু না হোক এম. এল. সি. হতে পারত। কিন্তু ভেক ধারণ করতে হবে শুনে ও বেঁকে বসল। ওকে অনেক করে বোঝানো হলো যে ভেক ধারণ করলেই বিলিতী মদ ছাড়তে হবে এমন কোনো

কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ও সাফ বলে দিল, ভণ্ডামির মধ্যে আমি নেই। শোন কথা!

ও যে নিষ্কর্মাকে সেই নিষ্কর্মা রয়ে গেল। তফাতের মধ্যে ওর স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ল। পরের বছর শীতকালে যখন আগ্রা গেল তখন ওর ঠোঁট অনবরত কাঁপছে। কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলছে, হয়তো একটা অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করছে, এক রাশ আবোল তাবোল হয়তো। বাক্যের উপর, কণ্ঠের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। পরক্ষণেই বলছে, য়্যাঁ! বলেছি আমি অমন কথা! অত্যন্ত ক্লিষ্ট কাতর মুখভাব। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। ওকে না ধরলে ও পড়ে যাবে। পোশাক পরিচ্ছদও আঁটসাঁট নয়। রাস্তার মাঝখানে খুলে যাবে। একদিন রাতের পায়জামা পরে দিনের বেলা আগ্রা শহরের বুকের উপর দিয়ে চলেছে, খেয়াল নেই যে ওটা তার শোবার ঘর নয়। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে বলছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে, আহা, কী মনোমুগ্ধকর! থেকে থেকে ভুরু কোঁচকায়, দাঁতে দাঁত চাপে। দিনের বেলা যখন তখন হাই তোলে। ঝিমিয়ে পড়ে। তার পর গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। চোখে ভয়ের চিহ্ন।

"ভাই সমীর," জয়দেব বলে আর্ত স্বরে, "আমার সমস্ত ক্ষণ ভয় কোন দিন ঘুমের মধ্যে চলে যাব। কেউ জানতে পাবে না যে আমি মরে গেছি। আমিও না। ভাবতেই আমার হাত পা জমে হিম হয়ে যায়। মাথা গরম হয়ে ওঠে চায়ের কেটলির মতো।"

"কেন ? এ রকম ভয় কেন ? এত ভয় কিসের ?" সমীরণ উদ্বেগের সঙ্গে সুধায়।

"জেগে থাকলে ভয় থাকে না। ঘুমিয়ে পড়লেই ভয়। সেইজন্যে আমি যতক্ষণ পারি জেগে থাকি। রাতটা এক রকম জেগে জেগেই কাটে। ঘুমোই কখন জানো ? দিনের বেলা যখন লোকজন চার দিকে রয়েছে। মারা গেলে টের পাবে। তার আগে ডাক্তারকে খবর দেবে। দিনের বেলা ডাক্তারকেও পাওয়া যাবে।"

সমীরণ শুনে অবাক হয়। জয়দেব বলতে থাকে, "দিনের বেলাও কি ঘুম আসে, ভাবছ ? যেই একটু অচেতন হয়ে পড়ি অমনি ধড়ফড় করে উঠে বসি। বুকে হাত দিয়ে দেখি, ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কি না। টিকটিক করে চলছে দেখে আশ্বস্ত হই।"

"ভারী দুঃখিত হলুম শুনে। তুমি ঘুমোও। আমার সামনেই ঘুমোও।"

"কিন্তু এই ঘুম যদি শেষ ঘুম হয় ?" জয়দেব বুদ্ধিমানের মতো বলে, "কী করে জানব যে শেষ ঘুম নয় ?"

"এসব মরবিড চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল, জয়। ঘুম পেলে নির্ভয়ে ঘুমোবে। জোর করে জেগে থেকো না। কই, এসব তো আগে শুনিনি ? কবে থেকে এমন হচ্ছে ?"

"অনেক দিন।"

সমীরণ জানতে চায় কোনো রকম চিকিৎসা চলছে কি না। জয়দেব বলে এক এক করে অনেক রকম চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষা করা গেছে। ইলেকট্রিক শক নেওয়াও হয়েছে।

সমীরণ শিউরে উঠল। "বলো কী! শক থেরাপি! তাতেও সারল না।"

"না। তাতে আরো খারাপ হলো।"

সমীরণ এই বার কথাটা পাড়ল। "তোমাকে আগেও বলেছি, ভাই। এখনো বলছি। তোমার হাতে কাজ নেই, অথচ টাকা আছে। এই থেকে তোমার রোগ। এর প্রতিকার হচ্ছে হাতে কাজ নেওয়া, হাত থেকে টাকা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া। যদি না ও টাকা তোমার স্বোপার্জিত হয়। আমার পরামর্শ শোন। তোমার চিকিৎসার প্রণালী ওয়ার্ক থেরাপি। এ যদি করো তোমার সব ভয় কেটে যাবে। তুমি বাঁচবে।"

জয়দেব কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়তে থাকল। "তোমার ওই এক কথা। কাজ। কাজ। কাজ। কী কাজ? কত বেতন? কতটুকু স্বাধীনতা? কী পরিমাণ তদ্বির তোয়াজ খোসামোদ? না জেনে না বুঝে অমনি ফস করে কাজ নিয়ে আমি ছুঁচো গিলে মরি আর কী! আর ঐ টাকাটা ঝেড়ে ফেলে দেবার কথা বলছ? ওটা আমারই মনের কথা। ফী মাসে একবার করে য়্যাটর্নির বাড়ী যাই। বলি, একটা ট্রাস্ট ডীড তৈরি করে দেখাতে পারেন? এ টাকা আমার নয়। আমি ট্রাস্টি।"

"তার পরে?"

"তার পরে আর কী? য়্যাটর্নি মুসাবিদা করে। আমার পছন্দ হয় না। প্রায়ই ব্যাকরণের ভুল থাকে। অমন অশুদ্ধ ইংরেজী দলিলে আমি হেন মানুষ সই করতে পারি?"

"মুসাবিদা ক'বছর ধরে চলছে ?"

"সাত আট বছর।"

সমীরণ গালে হাত দিয়ে থ' হয়ে বসল।

"হবে। হবে। ওটা পরের কথা। আগেরটা আগে। কথা হচ্ছে, কেন বাঁচব ? কার জন্যে বাঁচব ? তুমি এর উত্তর পেয়ে গেছ বলে দিন রাত খাটছ। সে খাটুনি শখের নয়, তবু সুখের। তুমি জানো যে তোমার উপর আরো পাঁচটি প্রাণীর ভাগ্য নির্ভর করছে। ভাই সমীর, তুমি যখন বলো যে কর্মই হচ্ছে সর্বরোগহর তখন তোমার মনে থাকে না যে আমার উপর একটি প্রাণীরও দায়িত্ব নেই।"

এইখানে জয়দেবের ব্যথা। ওয়ার্ক থেরাপি এর কী করতে পারে! তবু সমীরণ আরো একবার বলে দেখল। "সমাজের কাছ থেকে যা নিচ্ছ সমাজকে তার বিনিময় কী দিচ্ছ? তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সমাজ যে খরচটা করছে সেটা যারই তহবিল থেকে আসুক না কেন সমাজেরই তো বটে। তুমি তার বদলে সমাজকে শ্রম দান করছ না, বিদ্যা দান করছ না, সৃষ্টি দান করছ না, আনন্দ দান করছ না। তুমি কি খাতক নও ? চোর নও ?"

জয়দেব এর উত্তরে বলল, "আমার বিবেকও আমাকে দু'বেলা এই বলে খোঁটা দিচ্ছে। আমি বলছি, বেশ তো। আমি চলে যাচ্ছি এ জগৎ থেকে। তা হলে তোমাকে অত বিব্রত হতে হবে না। মরণ। মরণেই আমার সমাধান।"

সমীরণ তার বন্ধুর দুটো হাত চেপে ধরে বলল, "তোমাকে

বাঁচতে হবে, জয়। বলো, কী করলে তুমি বাঁচবে? তোমার শর্ত কী? তোমার জন্যে আমরা কী করতে পারি?"

জয়দেব ভেবে বলল, "কী আর করতে পারো? আমাকে যেতে দাও। একটা মানুষ বাড়লে বা কমলে কী আসে যায় দেশের বা ধরিত্রীর?"

সমীরণ তাকে পীড়াপীড়ি করল হোটেল থেকে উঠে গিয়ে সমীরণের বাসার অপর অংশ ভাড়া নিতে। তা হলে চোখে চোখে রাখতে পারবে তাকে।

"আমার কি অসাধ! কিন্তু দুটি জিনিস আমাকে দিয়ে হবে না। মাটিতে বসতে পারব না। পঁচিশ বছর বসিনি। দিশী ধরনের পায়খানায় যেতে পারব না। পঁচিশ বছর যাইনি। সত্যি আমার কষ্ট হয়। তোমরা বলবে সাহেবিয়ানা।" জয়দেব বন্ধুকে ধন্যবাদ জানালো। কিন্তু রাজী হলো না।

তখন সমীরণ আর করে কী! কলেজ থেকে এক মাস ছুটি নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল। অবশ্য আগ্রাতেই। রাত্রে বাড়ী গিয়ে শোয়। বাকী সময়টা ওকে চোখে চোখে রাখে।

এর ফলে জয়দেবের মনের আর একটা দিক অনাবৃত হলো। এত দিন হয়নি যে এইটেই আশ্চর্য। আগে যেমন ও কথায় কথায় মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলত এখন তেমনি আর একটি প্রসঙ্গ। কথায় কথায় সেক্স্। ঘোরতর নিন্দা করত, আদৌ অনুমোদন করত না, তবু পঞ্চাশ বার মুখে আনত। কান দুটো লাল হয়ে উঠত সমীরণের। পণ্ডিত হলে কী হয়, কাণ্ডজ্ঞান এত কম যে অন্য লোক শুনছে কি না গ্রাহ্য করত না।

এক দিন তো কুমকুমের সাক্ষাতেই এমন একটি শব্দ উচ্চারণ করল যে কুমকুম দৌড় দিয়ে উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েরা তখন বাড়ী ছিল না।

"জয়, তোমাকে আর একটা থেরাপি পরীক্ষা করতে হবে। আমার বৌ বার বার বলছে। আমি বলতে চাইনি, বিশ্বাস করিনি, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে বাঁচাতে হলে মেয়েলি টোটকাও কাজে লাগতে পারে।"

"কে বলছেন? বৌদি? তা হলে তো অবশ্য শুনতে হয়।"

"হাঁ। কিন্তু কী করতে বলছে, জানো?"

"কী?"

"আর এক বার বিয়ে।"

জয়দেব মনে মনে খুশি হলো। বাইরে এমন ভাব দেখাল যেন ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। তার পরে যা বলল তা সমীরণের কাছে নবসংবাদ।

বছর দুই আগে মুসৌরী বেড়াতে গিয়ে সে তার বন্ধু শার্দূল সিং-এর অতিথি হয়। শার্দূল তাকে নিয়ে যায় নিজের বন্ধুর বাড়ী আলাপ করিয়ে দিতে। সেখানে তার নিমন্ত্রণ হয় ডিনারে। বুফে ডিনার। যে যার প্লেট হাতে করে টেবল পরিক্রমা করতে করতে যার যা রুচি তুলে নেয়। প্লেট ভরে গেলে কোথাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বা চক্কর দিতে দিতে পেট ভরাতে হয়। খবরদার, বসতে পারবে না। ত্রিসীমানায় চেয়ারও নেই যে বসবে। এ হলো দাঁড়ানো ভোজ।

জয়দেব অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত নয়। কোথাও বসতে পারে কি না খুঁজতে খুঁজতে বাইরের বারান্দায় গিয়ে হাজির হলো। দেখল অন্ধকারে আরেক জন বসে খাচ্ছে। মেয়েটি তার অবস্থা অনুমান করে বলল, "আসুন, বসুন। ধরা যদি পড়ি তো এক সঙ্গে পড়া যাবে। আমি বলব, ইনি বসে-ছিলেন দেখে আমি বসেছি। আপনি বলবেন, ইনি বসেছিলেন দেখে আমি বসলুম। আপনি কি বাঙালী ?"

মেয়েটিও তাই। বাঙালী না হলে এমন ক্লেশকাতর কে হবে। পরিচয় দেওয়া নেওয়া হলে জয়দেব আবিষ্কার করল মেয়েটি আর কেউ নয়, ফুল। তার প্রথমা প্রিয়া। ফুল, যার সঙ্গে বিয়ের ফুল ফুটল না। সে অনেক কথা। সমীরণ কিছু কিছু জানে। সেই ফুল এখন বিধবা হয়ে পশ্চিমের একটি কলেজে অধ্যাপনা করছে। ছেলেমেয়ে হয়েছিল, জীবিত নেই। সেও এখন নিঃসঙ্গ।

কী সুন্দর হয়েছে তাকে দেখতে! পরিপূর্ণ গড়ন। পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদল। বয়স চল্লিশ হবে। বয়সেরও একটা মহিমা আছে। এ মহিমা আঠারো বছর বয়সে ছিল না। জয়দেব অন্ধকার বারান্দা থেকে আলোয় নিয়ে এলো তাকে। তার প্লেট আবার ভরে দিল। এবার মিষ্টিতে। আহা, তার জীবন যদি ভরে দিতে পারত আবার! এবার মাধুরীতে।

সেই দিনই লোকচক্ষের আড়ালে প্রস্তাব করল তার কাছে, "ফুল, তুমিও একাকী, আমিও একাকী। এসো, এ নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করি।"

"তার মানে কী? বিয়ে?" ফুল চমকে উঠল।

"হাঁ। বিয়ে। না করে যে ভুল করেছি করে সে ভুল সংশোধন করব।"

"ছি! তা কি হয়! তোমাকে বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে না স্মৃতির কাছে! আমাকে অজিতের কাছে? ইচ্ছা করলে আমরা বিয়ে করতে পারতুম যখন ওরা ছিল না। এখন ওরা নেই বলে কি আমরা বিয়ে করতে পারি!"

৩

সমীরণের মুখে কাহিনীটা শুনে কুমকুম বলল, "এখন বুঝতে পারছি ওঁর কী হয়েছে। কেন হয়েছে। কিন্তু ফুলটি কে? চেনো নাকি?"

"চিনতুম। গরিবের মেয়ে। অরক্ষণীয়া। বাপ পণ দিতে পারে না। জয়দেব বিনা পণে বিয়ে করতে রাজী। কিন্তু ওর বাবা নারাজ হলেন। ছেলে ভালো পাস করে জলপানি পেয়েছে, বিলেত যাবে, ফিরে এলে হবে সোনার খনি। বাংলা-দেশের দিক্‌পাল ছেলের বিয়ে দেবেন তিনি শুধুমাত্র সুন্দর মুখ দেখে? বিনা পণে বিয়ে করতে হয়, সমীরণ রয়েছে, ও তো ওই সব করে বেড়ায়, রোগীর সেবা, বন্যাপীড়িতের সাহায্য, আরো কত কী।"

কুমকুম হেসে বলল, "তা তুমি করলে পারতে। কেমন সুন্দরী বৌ পেতে।"

"তার বেলা দেখা গেল ওর বাপ জহুরী বটে। রূপের কদর

বোঝেন। অমন সুন্দর মেয়ের বিয়ে উনি যার তার সঙ্গে দেবেন না। হলোই বা অরক্ষণীয়া। জয়দেব বিলেত চলে গেলে ওর বিয়ে হয়ে গেল লখনউ প্রবাসী এক ডাক্তারের সঙ্গে। দোজবর।”

“তোমার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। কিন্তু কী করবে, বলো। তোমার কপালে লেখা ছিল আমার সঙ্গে বিয়ে, যেমন জয়দেবের কপালে লেখা ছিল স্মৃতির সঙ্গে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে জয়দেব আর ফুল কী করবে?”

“কী আর করতে পারে। মাঝখানে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে সেসব কি এত সহজে মুছে ফেলা যায়? ফুল আর বিয়ে করবে বলে মনে হয় না। জয়দেব করলেও করতে পারে। অন্য কোনো মেয়েকে।”

“তা হলে সেই পরামর্শ দাও ওঁকে। আর দেরি করে ফল কী হবে? দিন দিন বিয়ের অযোগ্য হয়ে উঠছেন না?”

সমীরণ বলল, “অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হলে ওর বিয়ে হয়ে যেত অনেক দিন আগে। আমার মনে হয় ও ফুলের জন্যেই অপেক্ষা করছে। করতে থাকবে, যদি বেঁচে থাকে।”

কুমকুম পরামর্শ দিল, “তুমি বরং ফুলকে একখানা চিঠি লেখো। কেউ যদি ওঁকে বাঁচাতে পারে তো সে তোমার ওই ফুল।”

সমীরণ রাত জেগে লিখল একখানা চিঠি। স্ত্রীকে পড়তে দিল, বন্ধুকে দিল না। দেখা যাক ফুল তার কী উত্তর দেয়

৫

যদি কোনো আশা না থাকে তা হলে জয়দেবের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কী ব্যবস্থা তা পরে ভাবা যাবে।

ফুল উত্তর দিল। দীর্ঘ উত্তর। তাতে তার জীবনের সব কথা ছিল। বিধবা হয়ে সে কত কষ্টে পড়াশুনা করেছে, পড়াশুনা করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। তার চাকরি তার কাছে এত মূল্যবান যে বিয়ের জন্যে সে তা ছাড়বে না। চাকরিও করবে ঘর সংসারও করবে, এমন যদি হতো তা হলে হয়তো বিয়ে করবে কি না ভেবে দেখত। কিন্তু জয়দেবের মতো বড়লোক স্ত্রীর কর্মস্থানে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকতেন না। কীই বা কাজ আছে যা তিনি করতে পারতেন!

আর একটা কথাও সে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছিল। জয়দেব হয়তো ছেলেমেয়ে চাইবেন। সে কিন্তু আর মা হতে চায় না।

চিঠিখানা কুমকুমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সমীরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জীবন কেন এত জটিল! যা হওয়া উচিত কেন তা হয় না! হলে কত ভালো হতো! তবু হবে না।

কুমকুমও গম্ভীর হয়ে গেল চিঠিখানা পড়ে। মাথা নেড়ে বলল, "কোনো আশা নেই। তুমি অন্য চেষ্টা দেখ।"

সমীরণ বন্ধুকে জানতে দিল না ফুল কী লিখেছে। এমনি কথায় কথায় বলল, "জয়, তোমার বৌদিদির মতে তোমার আবার বিয়ে করা উচিত।"

জয়দেব আগ্রহের সঙ্গে সুধালো, "কাকে? কাকে?"

"যাকে তোমার ভালো লাগে। মেয়ে দেখতে চাও তো দেখাতে পারি। এই আগ্রা শহরেই বহু বাঙালী পরিবার

আছেন। বিবাহযোগ্যা কন্যাও অনেক। বয়ঃস্থা পাত্রীও বড় কম নেই। চল না, বিনা নোটিসে বাড়ী বাড়ী কল করা যাবে। প্রবাসী বাঙালীর এত বড় সুহৃদ্ আর নেই, এই বলে আমি তোমার পরিচয় দেব। তার পরে তোমার ডি. লিট. ইত্যাদির উল্লেখ করব।"

জয়দেব দু'হাত তুলে নমস্কার করে বলল, "না, ভাই। জীবনে আর ও পাট নয়। বিয়ের আগে ওসব ঢের হয়েছে। আমাকে যেতে দাও।"

সমীরণ বুঝতে পারল জয়দেব সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। যেমন কাজকর্মের চেষ্টা তেমনি বিবাহের চেষ্টা। ওর দিক থেকে উদ্যম নেই, উদ্‌যোগ নেই। বন্ধুরা যদি তৎপর হয়ে কিছু করতে পারে করুক। ওর মনের মতো হলে ও সায় দেবে, না হলে দেবে না। তিলে তিলে মরবে।

"অদ্ভুত লোক।" মন্তব্য করল কুমকুম।

"কিন্তু আমি ভাবছি কী করে ও বাঁচবে!" সমীরণ মুখ ভার করে রইল।

"ভগবান জানেন। তুমি আমি কী করতে পারি!"

"এখনো একটি পদক্ষেপ বাকী আছে। সেইটি নেওয়া যাক।"

"সেটি কী?"

"ফুলের চিঠিখানা ওকে পড়ে শোনানো।"

কুমকুম বলল, "তার আগে একবার ওঁর হার্ট পরীক্ষা করা দরকার। কে জানে, যদি হার্ট ফেল করে মারা যান!"

সমীরণ ভয়ে ভয়ে চিঠিখানা পকেটে পুরে জয়দেবের হোটেলে চলল। সবটা ওকে পড়ে শোনাতে হবে না। যেটুকু ও সইতে পারবে সেইটুকুই শোনাবে।

জয়দেব শেক্‌স্‌পীয়ার থেকে আবৃত্তি করছিল। "টু বি অর নট টু বি।" হ্যামলেটের সেই প্রসিদ্ধ স্বগতোক্তি। সমীরণকে দেখে বলল, "তার পর, হোরেশিও। কী সমাচার? তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বড় কেক কিনেছি আজ।"

সমীরণ তাকে আস্তে আস্তে প্রস্তুত করে নিল। তারপরে চিঠিখানা খুলে পড়ল। ভয় করেছিল জয়দেব আঘাত পেয়ে মুষড়ে পড়বে, হয়তো মূর্ছা যাবে। কিন্তু যা দেখল তা অবিশ্বাস্য। খপ করে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে জয়দেব বুকে ধরল। তার চোখে আনন্দর অশ্রু। মুখ দিয়ে কথা সরে না।

"তা হলে, হ্যামলেট। কী করবে?"

"ফুল যা করতে বলবে তাই করব। সব ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে থাকতে বলে, থাকব। ওকে ছাড়তে হবে না কিছু।"

"তা হলে তুমি বাঁচবে তো?"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। ফুল যদি বাঁচায় নিশ্চয় বাঁচব।"

"কিন্তু মনে রেখো," সমীরণ তাকে সতর্ক করে দিল, "ও চাকরি ছাড়বে না। লখনউতে ওর নিজের জায়গায় থাকবে। তুমি পারবে লখনউতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে? ওখানকার সমাজে হাস্যাস্পদ হতে? সেবার ঘরজামাই হয়েছিলে, এবার ঘরস্বামী হতে?"

জয়দেব গদগদ স্বরে বলল, "পারব, পারব। সব কিছু পারব। ফুল রাজী হলে আমিও রাজী। এতদিন লুকিয়ে রেখেছ। বলোনি কেন?"

"কিন্তু, জয়, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয়। ও তো স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তুমি হয়তো ছেলেমেয়ে চাইবে, ও কিন্তু মা হবে না আর।"

"না হলেও আমার নালিশ করবার কিছু থাকবে না। সকলের কি ছেলেমেয়ে হয়! কত মেয়ে বন্ধ্যা! কত পুরুষ বন্ধ্য!"

সমীরণ ভেবেচিন্তে বলল, "বেশ, তা হলে তাই হোক। এখন তুমি সোজা লখনউ চলে যাও। ফুলের সঙ্গে মোকাবিলা করো। চিঠিপত্রে পাকাপাকি হতে পারে না।"

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

"কেন? দরকার আছে?"

"গেলে ভালো হতো।"

সব কথা শুনে কুমকুম বলল, "আশ্চর্য লোক। এমন স্ত্রৈণ আমি দেখিনি। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে যাও তুমিও পত্নীব্রত হবে। আমার কিন্তু কী মনে হয়, জানো? ফুল তোমাদের দু'জনকেই 'ফুল' করবে। পাঁজি দেখে যেয়ো, যাতে এপ্রিল ফুল হতে না হয়।"

চলল দুই বন্ধু লখনউ। সেই প্রথম যৌবনের মতো উৎসাহ নিয়ে।

ফুলকে চিঠি লিখে তার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। সে তাদের অভ্যর্থনা করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে

ফুলের বোনেরা থাকে। একজনের বিয়ে হয়নি এখনো। আরেক জন বিরহিণী, স্বামী বিদেশে।

আপ্যায়নের পালা শেষ হলে যখন কাজের কথার সময় এলো ফুল ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চিড়িয়াখানা দেখাতে। লখনউর চিড়িয়াখানার চারদিকে বেড়া নেই। অতি চমৎকার নৈসর্গিক পরিবেশ। বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ স্থান।

সমীরণই কথাটা পাড়ল। বলল, "ফুল, তোমার তো মনে আছে পঁচিশ বছর আগে কী হয়েছিল। দোষটা জয়দেবের ছিল না। অবশ্য পিতার অবাধ্য হতে পারত। কিন্তু তা হলে ওর বিলেত যাওয়া হতো না।"

"সে সব যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কী করতে হবে, তাই বলো।"

"তুমি যা বলবে। ও তোমার উপরে সমস্ত ছেড়ে দিয়েছে।"

ফুল ফিক করে হেসে বলল, "ওঃ। তাই নাকি!" তারপরে সকৌতুকে বলল, "আমি যা বলব তাই হবে?"

জয়দেব অস্ফুট স্বরে বলল, "তাই হবে।"

ফুলের উজ্জ্বল চোখ টর্চের মতো পড়ল জয়দেবের মুখে। সে চাউনি তার মর্ম ভেদ করল। ফুল বলল হাসতে হাসতে তামাশা করে কি সত্যি সত্যি সত্যি, "আমি বলি তুমি আমার বোন গুল-কে বিয়ে করো। দেখলে তো আমার চেয়েও সুন্দরী। এম. এ. পাস করে বসে আছে। কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। তোমাকে হবে, আমি জানি।"

সমীরণ লক্ষ্য করল জয়দেব একদম ঘাবড়ে গেল। পড়ে যেত, যদি না সমীরণ তাকে ধরে ফেলত। তিন জনেই বসল একটা নিরিবিলি কোণ দেখে।

ফুল বলল, "সমীরণদা, তুমিই বলো, যার ছোট বোন আটাশ বছর বয়সেও অনূঢ়া সে যদি এমন একটি অসাধারণ সুপাত্র পায় তা হলে বোনের বিয়ে দেবে, না নিজের সুখ খুঁজবে?"

সমীরণ বলল, "কিন্তু এই যদি তোমার মনে ছিল, ফুল, তা হলে আমাদের কেন আগে সে কথা জানালে না?"

"জানালে কী হতো? তোমরা আসতে না?"

জয়দেব এর উত্তর দেবে ভেবে সমীরণ নিরুত্তর রইল। কিন্তু সেও নির্বাক। কী ভাবছে সেই জানে। বোধ হয় সেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেটের মতো "টু বি অর নট টু বি?"

ফুল স্তব্ধতা ভঙ্গ করল। বলল, "তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, জয়। আমি যে তোমার সেবা করতে পারব সে আশা দুরাশা। আমাকে খেটে খেতে হয়, আমার অত সময় কোথায়! আমি তো আমার চাকরিটি ছাড়ব না। কী পাবে তুমি আমার কাছ থেকে? আর একটা কথা তো চিঠিতেই খুলে বলেছি। মুখে নাই বা বললুম।"

জয়দেব তখনো নির্বাক। মনে হলো সে ফুলের সঙ্গে একমত। সমীরণ তার বন্ধুর জন্যে রীতিমতো লজ্জিত বোধ করছিল। বিয়ে পাগলা হয়তো ফুলের বদলে গুল-কেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাবে। ফুলের পক্ষে কত বড় অপমান! এক

জীবনে বার বার ছু'বার! ফুল কি প্রথম বারের অপমান ভুলতে পেরেছে!

ফুল যেন হুল ফুটিয়ে দিল। "জয়, তুমি ক'বার ঘরজামাই হবে! আমাকে বিয়ে করলে ও ছাড়া তোমার গতি নেই। আমি তোমার কলকাতার বাড়ীতে গৃহিণীপনা করতে যাচ্ছিনে। তোমাকেই আসতে হবে আমার লখনউর বাড়ীতে আমার সঙ্গী হতে। তার চেয়ে গুল-কে বিয়ে করে নিয়ে যাও। ও তোমার কোনো দুঃখ রাখবে না। তোমার ঘরসংসার দেখবে। তোমার ছেলেমেয়ের মা হবে। তোমার সেবা করবে।"

এই বার জয়দেবের মুখ ফুটল। সে সমীরণকে সম্বোধন করে বলল, "তুমিই বুঝিয়ে বোলো ফুলকে। আমি বললে কি বিশ্বাস হবে ওর! আমি চাই স্মৃতির ধন ভোগ না করতে। তার মানে সম্পূর্ণ নির্ধন হতে। ভিখারী শিবকে বিয়ে করতে চাইবে কোন উমা! গুল কখনো রাজী হবে না। ফুল যদি রাজী হয়। হবে কি?"

ফুল তার ডান হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলল, "ঈশ্বর সাক্ষী। সমীরণদা সাক্ষী। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি ছাড়া তোমার—"

"কেউ নেই, ফুল, কিছু নেই।" জয়দেব ভেঙে পড়ল।

সমীরণ তাদের আশীর্বাদ করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল।

(১৯৫৪)

আপ ট্রেন ডাউন ট্রেন

ক্ষিদেও পেয়েছে, খাবারও তৈরি, কিন্তু পেটের ক্ষিদে পেটে চেপে রেখে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলতে হচ্ছে, "থাক, তাড়া কিসের ? আগে রক্ষিত সাহেব ফিরুন।"

আটটা। ন'টা। দশটা বাজল। তবু দেখা নেই গৃহকর্তার। ছটফট করতে থাকল দীপক। দুপুর বেলা সেই যে কলকাতায় দুটি খেয়েছে তার পর এক পেয়ালা চা পর্যন্ত মুখে দেয়নি। আশা করেছিল ট্রেন থেকে নেমে দেখবে মোটর হাজির, মোটর থেকে নেমে শুনবে চা তৈয়ার। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ডাউনিং সাহেব তাকে হতাশ করলেন।

স্টেশনে না ছিল মোটর, না ছিল নাজির চাপরাশি। খাড়া ছিল খান কয়েক ঘোড়ার গাড়ী। থার্ড ক্লাস। তারই একখানায় মাল চাপিয়ে দিল কুলী।

"কোথায় নিয়ে যাব ?" জানতে চাইল গাড়োয়ান।

"কোথায় নিয়ে যাবে ?" তাই তো। একটু ভেবে বলল দীপক, "চলো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি !" আধ ঘণ্টা লেগে গেল যেতে।

ডাউনিং তখন ডিনারের জন্যে বেশ বদল করছিলেন। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল দর্শন পেতে। "ওহ। ইউ

আর দি নিউ য়্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কাস্টগীর।” হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, “সো প্লীজড টু মীট ইউ।”

উপরে নিয়ে গিয়ে আদর করে বসালেন। আপ্যায়ন করতে ডাক দিলেন খিদমদগারকে। চা না কফি না কোল্‌ড ড্রিঙ্ক? কিন্তু দীপকের এমন দুর্বুদ্ধি। বলে বসল, লেমন স্কোয়াশ। তার কারণ চায়ের সময় পেরিয়ে গেছে, সাহেব মনে করবেন বাঙালী।

তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করতে পারে না, আমার জন্যে কোথায় ব্যবস্থা করেছেন, নিজের কুঠিতে না সারকিউ হাউসে, তিনিও তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। তাঁর মনে পড়ে গেছে স্বদেশের কথা। খাস্তগীর সম্প্রতি সে দেশ থেকে ফিরছে। বলতে পারবে সেখানকার অভিনবতম সমাচার।

খোশগল্প চলল তো চলল। ফুরোয় না। শেষে সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফ দিয়ে উঠলেন। তাঁর একটা এনগেজমেণ্ট আছে। তখন দীপক জানতে চাইল মুখ ফুটে, সে আজ কোথায় উঠবে।

“সে কী! র‍্যাকশিট আপনাকে স্টেশনে মীট করেননি! আমার ধারণা ছিল তিনি আপনার বন্ধু। তাঁকেই আমি আপনার চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলুম। কোই হ্যায়?” চাপরাশিকে হুকুম করলেন ছোট সাহেবকে ছোট সাহেবের কুঠি পৌঁছে দিতে।

ছোট সাহেবরা যে কুঠিতে থাকেন সেটাকে বলা হয় ‘চামারি’। সেখানে গিয়ে দেখল রক্ষিত নেই, শুনল কাল

সকালেই তিনি সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে চলে যাচ্ছেন, তাই আজ সারা দিন ব্যস্ত ছিলেন, এখন গেছেন বিদায় নিতে। দীপককে অভ্যর্থনা করার ভার পড়েছিল নাজির বাবুর উপর, তিনি তাকে চিনতে পারেননি। মোটর তো ভাড়া পাওয়া যায় না, ঘোড়ার গাড়ী একখানা ঠিক করে রেখেছিলেন। সেটা ফার্স্ট ক্লাস।

লণ্ডন থেকে সন্ত প্রত্যাগত দীপক 'চামারি' কুঠির বারান্দায় আসন নিয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকল তার একমাত্র পরিচিত জন নীহারবিন্দু রক্ষিতের। চোখ বুজে আসছে তন্দ্রায়, ঘুম ভালো হয়নি কয়েক রাত। আর ক্ষিদে পাচ্ছে অভদ্রের মতো।

"আরে! আপনি!" রক্ষিত এসে তন্দ্রা ভেঙে দিলেন। "আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। মাফ করবেন। পার্টিং কল দিতে বেরিয়েছিলুম। কেউ কি সহজে উঠতে দেয়? বারোটা মাস এক স্টেশনে ছিলুম। মনে হয় কতকাল।"

দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। নানা রাজ্যের গল্প। রক্ষিত বললেন, "কাল থেকে এ বাড়ী আপনার। আসবাব যত দিন নিজের না কিনছেন তত দিন আমার গুলো ব্যবহার করতে পারেন, তবে চার মাস পরে আমি এসে নিয়ে যাব। যদি বদলি হই। বাবুর্চিকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, সে এই জেলার লোক, মন্দ রাঁধে না, ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারেন। বেয়ারা কি সঙ্গে এনেছেন?"

"না। এখানে পাওয়া যায় না?"

"সাধারণত না। তবে এই মুহূর্তে যে লোকটি আমার কাজ করছে তাকে বদলি দিয়ে গেছে আমার বেয়ারা। লোকটি ভালো। সাহেবদের কাছে সারা জীবন কাজ করেছে, এখন বেকার। তা হলে আপনার সব সমস্যা একে একে মিটল। ঘরসংসার শুরু করে দেবার পক্ষে এই যথেষ্ট। আরো দু'একটা লোকের দরকার হবে, দেখে শুনে রাখবেন। বাগান আমি করিনি, আপনার শখ আছে কি না জানিনে।"

"জায়গা আছে তো?"

"প্রচুর। কিন্তু সময় দেওয়া শক্ত। কাল এগারোটার সময় নাজির এসে আপনাকে কাছারিতে নিয়ে যাবে। সেরেস্তাদার আপনাকে একখানা প্রোগ্রাম দেবে। কোন্ ডিপার্টমেণ্টে কয় সপ্তাহ কাজ শিখবেন। ট্রেজারি আর সেসন্‌স্ এই দুটোই গোলমেলে। আর সব সোজা। কিছু দিন পরে আপনাকে থার্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হবে। তখন ছোট ছোট মামলা বিচার করবেন। ধান কাটা, গোরু চুরি, অনধিকার প্রবেশ, এই সব।" শুনে তাজ্জব লাগছিল দীপকের। কী মুল্লুক রে, বাবা!

"আপনাকে এখানে এক বছর রাখবে যাতে আপনার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে সুবিধে হয়। রেভিনিউ ল-টাই ওর মধ্যে শক্ত। একটু পড়বেন শুনবেন। তবে সামাজিকতার দিকটা অবহেলা করবেন না। ওটা এই সার্ভিসের অলিখিত নিয়ম। ম্যাজিস্ট্রেটের ওখানে কল করেছেন। তিনি চিরকুমার। কাল জজের ওখানে দু'খানা কার্ড ড্রপ করে আসবেন। তিনি

বিবাহিত। বাঙালী। কাল কিংবা পরশু সিভিল সার্জনের ওখানে একখানা কার্ড। তিনিও বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রী এখানে থাকেন না। পাঞ্জাবী ক্রিশ্চান। এস. পি. পাঞ্জাবী হিন্দু। তাঁর ওখানে তিনখানা কার্ড দিলে ভালো হয়, তাঁর বড় মেয়ে এখানে এসেছেন। এ ছাড়া আর যেখানে যেখানে কল করতে হবে তার তালিকা রয়েছে আমার পকেটে। এই নিন। ধীরেসুস্থে করবেন। তবে ক্লাবের সেক্রেটারির নামে যে কার্ড সেটা কাল সকালে বা বিকালে ক্লাবে গিয়ে নোটিস বোর্ডে এঁটে দিয়ে আসবেন। মার্কারের হাতে দিলেও চলবে।”

দীপক ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, “ক্লাবের মেম্বর হতে হলে কী করতে হয় ?”

“ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি আপনার হয়ে বলে রেখেছি। তিনি আর জজ প্রপোজ ও সেকণ্ড করবেন। তার পর আপনার জন্যে একটা বাক্‌স বরাদ্দ হবে। তাতে প্রত্যেক মেম্বর খুশি মতো বল ফেলবেন। একটা ব্ল্যাক বল পড়লেই নির্বাচন অসিদ্ধ। কিন্তু সে রকম সচরাচর এখানে হয় না। আপনার চাঁদাটা এদের খুব দরকার। আপনি যে খরচটা করবেন খেয়ে ও খাইয়ে, তার থেকে এদের মোটা আয় হবে। ভয় নেই। ইচ্ছা করলে আপনি শুধু টেনিস খেলেই বাড়ী পালিয়ে আসতে পারেন। টেনিসটা খেলবেন কিন্তু। শীতকালটা মাটি করবেন না। আমার আফসোস হচ্ছে আমি আপাতত টেনিস খেলতে পাব না।”

রাত হয়েছিল। দু’জনে ঘুমোতে গেল। পরের দিন

ভোরে উঠে রক্ষিত চলে গেলেন। তাঁর বাড়ী হলো খাস্ত-গীরের বাড়ী। নিজের বাড়ীতে মালিক হয়ে বসা এই প্রথম। একে একে সবাই এসে সেলাম ঠুকতে লাগল। বাবুর্চি বেয়ারা জমাদার পানিওয়ালা চাপরাশি। দেখতে দেখতে নাজির এসে হাজির। এই ভাবে সংসার-যাত্রা শুরু হলো। কাছারি ক্লাব। বাড়ী বাড়ী কল্।

রক্ষিত যাবার সময় বলেছিলেন, "যদিও আমার তালিকায় নাম নেই তবু আপনার কল্ করা উচিত প্রিন্সিপালের ওখানে। দু'খানা কার্ড। সরকারী কর্মচারী নন, ইউরোপীয় নন, বনেদী জমিদার নন, ক্লাবের মেম্বর নন, তাই কেউ কল্ করে না, আমিও করিনি। পরে অনুতাপ করেছি। আলাপ হলো দেরিতে। দেখলুম আমিই ঠকে গেছি। ওঁদের মতো কালচার্ড পরিবার এ তল্লাটে নেই। যাবেন একদিন মনে করে।"

তালিকা ধরে কল্ করতে করতে এই নামটিই ভুলে গেল দীপক। ভুলে যাওয়ার অজুহাত ছিল। হঠাৎ লাট সাহেব এসে দরবার করলেন। বড় বড় পার্টি দেওয়া হলো তাঁকে। তিনিও বেছে বেছে পার্টিতে ডাকলেন। দীপক ছিল সর্ব ঘটে। ওদিকে ক্লাবও সরগরম। শীতকালের একটাও সন্ধ্যা ফাঁক যায় না। ক্লাবের বাইরেও আসর জমে। জজের বাড়ীতে কয়েকজন তরুণী অতিথি এসেছিলেন। নৃত্যের আয়োজন ছিল। জজগৃহিণীর স্বহস্তে লেখা নিমন্ত্রণী।

সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করতে করতে কত কী যে ভুলে গেল

দীপক। শুধু এই নয়। তারপর কেমন করে একদিন প্রিন্সিপাল সর্বাধিকারীর সামনাসামনি পড়ে যায়। ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা হলো তার। বলল, "আপনার ওখানে কল্ করতে চাই। কবে ও কখন আসতে পারি ?"

"যবে ও যখন আপনার সুবিধে। আমরা তো কবে থেকে আপনার পথ চেয়ে বসে আছি। রক্ষিতের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি যে।"

ভদ্রলোকের চুলে পাক ধরেছে। গোঁফ দাড়ি কামানো। গম্ভীর, সৌম্য, স্নেহশীল। খদ্দরের ধুতী পাঞ্জাবী পরেন। শীতের জন্যে একখানা শাল গায়ে জড়িয়েছেন। চোখে চশমা। সুগঠিত, সবল। দীপক জানত না তিনি দীর্ঘকাল আমেরিকায় ছিলেন। বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল। সরকারী মহলে প্রয়োজন না হলে মেশেন না।

সেই দিনই সে সন্ধ্যাবেলা তাঁর ওখানে হাজির হলো। ছ'খানা কার্ড পাঠাল ভিতরে। তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে তাকে স্বাগত করলেন। যেখানে নিয়ে গেলেন সেটা দোতালার ঘরের সামনের খোলা চাতাল। যেখানে বসে ধ্যান করা যায়, এমনি শান্ত পরিবেশ। মোড়া ছিল, সতরঞ্চি পাতা ছিল। মোড়া এগিয়ে দিলেন তার দিকে, নিজে বসলেন সতরঞ্চির উপর।

"না, না। আমি মাটিতেই বসব।" বলে দীপক তাঁর সঙ্গে আসন নিল।

আলাপ পরিচয় হলো। দীপকের কেবল ছঃখ হতে

থাকল, একই শহরে এত দিন থেকে এঁর সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

অন্যমনস্ক ছিল। কখন এক সময় মিসেস সর্বাধিকারী এসে নমস্কার জানালেন। সে উঠে দাঁড়ালো। তিনি বললেন, "সাহেবী পোশাক পরে মাটিতে বসতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার। কোনো রকম কুণ্ঠা বোধ করবেন না। মনে করুন এ আপনার নিজের ঘর। নয়তো আমিই সমস্ত ক্ষণ আপনার দশা ভেবে সঙ্কোচ বোধ করব।"

অগত্যা বসতে হলো মোড়ায়। কিন্তু ওঁরা দু'জনে নিচে, সে উপরে, কী লজ্জার কথা। সে আবার নিচে নেমে এক পাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসল। ওঁরা হাসলেন।

ভদ্রমহিলাকে অল্পবয়সীর মতো দেখায়। যেন জায়া নন, কন্যা। মুখে চোখে লাবণ্য, কণ্ঠস্বরে লালিত্য। ছিপছিপে গড়ন। সুন্দর রং। কিন্তু কিসের একটা ছায়া তাঁকে ঘিরে রয়েছে। তাঁর হাসিও হাসির মতো লাগে না।

"আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। কিন্তু আজ নয়। আরেক দিন।" বললেন মিসেস সর্বাধিকারী।

"আরো আগে আসা উচিত ছিল। অন্যায় হয়ে গেছে।" দীপক অপরাধীর মতো বলল। কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করল।

"না, সে জন্যে নয়। সে জন্যে বড় জোর অভিমান করতে পারি। ঝগড়া করব কেন? ঝগড়ার অন্য কারণ আছে।"

দীপকের কৌতূহল জন্মাল। বলল, "তা হলে আর মুলতুবি রেখে কাজ কী? বলেই ফেলুন। শোনাই যাক।"

"ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি? আপনারা হলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

"নির্ভয়ে বলুন। মোটে তো থার্ডক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা।"

এই নিয়ে হাসাহাসি পড়ে গেল। তার পরে তিনি বললেন, "আমার মনে হয় আপনার চাকরিতে আসা ঠিক হয়নি। কেন এলেন?"

"সে কথা যদি বলি আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না। আমার আচরণ আমার উক্তির প্রতিবাদ করবে। ওটা গোপন থাক।"

"গোপন থাকবে?" তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, "আচ্ছা। পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু এলেন তো এখানে এলেন কেন? এই মরা শহরে?"

"মরা শহর!" দীপক প্রিন্সিপালের দিকে চেয়ে বলল, "আপনার কি তাই মনে হয়, ডকটর সর্বাধিকারী?"

"সুধার ওটা বাড়াবাড়ি। আমি হলে বলতুম মুমূর্ষু শহর। কলকাতা আমাদের সব কটা শহরের গুণী জ্ঞানীদের চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মফঃস্বলে জোর করে না পাঠালে কেউ আসতে চায় না। এই আপনিও কি আসতেন?"

দীপক বলল, "আমার কলকাতা ভালো লাগে না। জোর করে না পাঠালে আমি বিলেতেই থেকে যেতুম।"

"যথার্থ। আমিও ঠিক সেই কথাই বলতে চেয়েছি। জোর করে একটা দেশের জ্ঞানীগুণীদের মফঃস্বলে আটকে রাখা যায় না। বুঝি সব। কিন্তু যে-আমি সব প্রলোভন ছেড়ে

আমেরিকা থেকে চলে এসেছি সে-আমি নিশ্চয় আশা করতে পারি যে অন্যান্যেরা সব প্রলোভন ছেড়ে কলকাতা থেকে চলে আসবেন। তারপর চলে যাবেন আরো অভ্যন্তরে। মহকুমায় থানায়। গ্রামে। তবে তো মুমূর্ষু দেশ প্রাণ পাবে।”

দীপক লক্ষ্য করল সুধা দেবীর মুখ আরো অন্ধকার। বুঝতে পারল এই নিয়ে স্বামীস্ত্রীতে মতান্তর। দু'জনকে খুশি করার জন্যে বলল, “যা বলেছেন সব ঠিক, তবে কিনা ত্যাগ করতে কাউকে বাধ্য করা সঙ্গত নয়। এমন কি প্রিয়জনকেও না।”

সর্বাধিকারী আহত হলেন। বললেন, “আমেরিকার মেয়েরা যদি সঙ্গে না যেত ছেলেরা একা পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করতে করতে যেতে পারত না। অত বড় মহাদেশটা ফাঁকা পড়ে থাকত। সবাই ভিড় করত নিউ ইয়র্কে আর ফিলাডেলফিয়ায় আর বোস্টনে। আমাদেরও উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে যেখানে যেখানে প্রান্তর পড়ে আছে, কিংবা পড়ে আছে অনাবাদী জমি, কিংবা জলা। এক দিনে সেখানে বিদ্যুতের আলো পাওয়া যাবে না। কিন্তু যাবে এক দিন। তার জন্যে সবুর করতে হবে। রোম এক দিনে গড়া হয়নি।”

দীপক লক্ষ্য করছিল সুধা দেবী এর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি সংহত করছিলেন, কিন্তু তার শেষ পরিণতি হলো বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। সে দু'দিক রাখতে গিয়ে বলল, “খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু এদেশ তো আমেরিকা নয়। এখানে মানুষের মন গ্রামে বাস করতে করতে অসাড় হয়ে গেছে। শহরের দিকেই তার

সহজ প্রবণতা। শহর থেকে আরো বড় শহরে। যেখানে জীবনের স্পন্দন অনুভব করবে যত বেশী। মেয়েরাও গ্রামের চেয়ে শহরে অনেকটা স্বাধীন। এ স্বাধীনতা ছাড়তে বললে ওরা ছাড়বে হয়তো। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে নয়।"

দীপক লক্ষ্য করল সুধা দেবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। সর্বাধিকারী নীরবে ধ্যান করতে লাগলেন। বোধ হয় ভাবী ভারতের রূপ।

এলোমেলো আলোচনার পর সেদিনকার মতো উঠল দীপক। সুধা দেবী তাকে আরেক দিন আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। সে স্বীকার করল।

বললেন, "আসবেন মাঝে মাঝে। না এলে দুঃখ পাব। এই যে এত দিন আসেননি এর জন্যে কী ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করেছি। আধ মাইল মাত্র ব্যবধান। তবু আট হাজার মাইলের মতো। উনি তবু বাইরে বেশীর ভাগ সময় থাকেন। আমি কোথাও বেরোইনে। বেরোতে ইচ্ছে করে না। কী দেখব? কী শুনব? দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে পচে গেছে। এটাও একটা বড় মাপের পাড়া গাঁ। কিসের স্বাধীনতা? লোকনিন্দায় কান পাতা যায় না। আসবেন কিন্তু।"

২

বিলেত থেকে ফেরবার সময় দীপক এক রাশ গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে এনেছিল। কিন্তু গ্রামোফোন আনেনি। যে টাকা দিয়ে গ্রামোফোন কিনবে মনে করেছিল সে টাকা গেল

পোশাকের পিছনে। দেশে ফিরে হাতে টাকা জমতে অনেক দেরি হচ্ছিল, তাই রেকর্ডগুলো শিকায় তোলা ছিল। আহারের দিন কথায় কথায় এ কথাটা উঠল।

তা শুনে সুধা দেবী বললেন, "আমাদের গ্রামোফোন আছে কিন্তু রেকর্ডগুলো পুরোনো একঘেয়ে। বাজাতে ইচ্ছা করে না। গ্রামোফোন আপনি নিয়ে যান। যত দিন দরকার রাখবেন।"

"তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। রেকর্ডগুলো আপনার কাছে থাকবে, আমি যখন খুশি এসে বাজাব। অবশ্য আপনিও বাজাবেন যখন খুশি।"

তাই হলো। রেকর্ড যেদিন বাজল সেদিন তার কী আনন্দ! সুধী দেবীও প্রদীপ্ত হয়ে বললেন, "আঃ! কতকাল পরে বেঠোফন আর মোৎসার্ট শুনতে পেলুম।"

দু'জনে মিলে স্থির করা গেল মাসে মাসে দু'খানা করে নতুন রেকর্ড কেনা যাবে। ভালো বিলিতী রেকর্ড। পরে যখন দীপক বদলি হবে তখন আধাআধি বখরা হবে।

সর্বাধিকারীর সঙ্গীতে অধিকার ছিল না। তিনি তাঁর কলেজের কাজকর্মের থেকে অবকাশ পেলে নক্শা নিয়ে বসতেন বা নির্জনে ধ্যান করতে বসতেন। উপনিবেশ রচনা করতে হবে। মাত্র পাঁচশো বিঘা জমি জুটলে এখনি শুরু করে দেওয়া যায়। আশ্রম কথাটা তিনি পছন্দ করেন না। কেমন একটা প্রাচীন-প্রাচীন ধর্ম-ধর্ম গন্ধ। ফিনিক্স্ সেটল-মেণ্ট, টলস্টয় ফার্ম এসব করার পর কেন যে কেউ শবরমতী

আশ্রম করে তিনি তা বুঝতে অক্ষম। গান্ধীর সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর তর্ক হয়ে গেছে। উপনিবেশে ধর্ম যে থাকবে না তা নয়, কিন্তু আসল আইডিয়াটা ধর্মের পুনরুদয় নয়, এমন কি গ্রাম্য সভ্যতার পুনরুদয় নয়, সকলে মিলে মিশে থাকা, নিজেরাই জনমজুর খাটা, মাটি কাটা থেকে বাড়ী তৈরি করা পর্যন্ত সব নিজেদের হাতে, লাঙল দেওয়া থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত সমস্ত নিজেদের হাতে। সকলে একসঙ্গে খাওয়া, সকলে একসঙ্গে খেলা, সকলে একসঙ্গে প্রার্থনা করা, সকলে একই আবাসের আবাসিক হওয়া। গ্রামের লোক কি করবে এসব! বৃথা চেষ্টা। তার চেয়ে পত্তন করো নতুন উপনিবেশ। নতুন প্রাণকেন্দ্র।

দীপককে তিনি তাঁর নকশা দেখতে দিতেন। সে সহানুভূতি প্রকাশ করত। বলত, "কেন হবে না? নিশ্চয় হবে। আপনি গান্ধীর কথা শুনবেন না। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধী দু'হাজার বছর পেছিয়ে গেছেন। নতুন দেশ থেকে পুরোনো দেশে এলে যা হয়। তবে আপনি এই মনোভাব থেকে মুক্ত।"

"হাঁ। টি. এস. এলিয়টের যা হয়েছে। ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়ে মধ্যযুগে ফিরে গেছেন। আপনাকেও সতর্ক থাকতে হবে, খাস্তগীর। দেশে ফিরে এসেছেন, ভালোই করেছেন, কিন্তু আপনার কাজ হবে দেশকে আধুনিক করা, নিজেকে প্রাচীন করা নয়।"

"কিন্তু এখানকার আবহাওয়া এমন যে এই ক'মাসেই

আমার পূর্ব জন্মের স্মৃতি ফিরে এসেছে। মনে হচ্ছে কোনো দিন ইউরোপে যাইনি। ওটা স্বপ্ন।”

সুধা দেবীর সঙ্গে কথোপকথনের ধারা অন্যরূপ। তিনি বলতেন, “উপনিবেশটা নতুন হতে পারে, কিন্তু মানুষগুলো তো সেই অযোধ্যার প্রজা, সীতাকে যারা বনবাসে দিয়েছিল। সেই সব দুর্মুখ আর সেই রামই তো থাকবে উপনিবেশে। পচা ডোবার মতো পঙ্কিল যাদের মন তারা শিব গড়তে গিয়ে বাঁদরই গড়বে। আর কিছু গড়তে জানলে তো? আমি ওর মধ্যে নেই। আমার স্থান কলকাতায়, কলকাতা অসহ্য হলে লণ্ডনে। কেন যে তুমি ফিরে এলে, দীপক! দীপক বলছি বলে, তুমি বলছি বলে, কিছু মনে করছ না তো?”

“মোটেই না। আমার দিদি নেই। আপনিই আমার দিদি।”

“তা হলে আপনি বলে পর করে দিচ্ছ কেন?”

“বেশ, তা হলে এখন থেকে তুমি।”

“তোমার চলে আসা ভুল হয়েছে। ওঁরও। কথা ছিল উনি এসে আমাকে ও দেশে নিয়ে যাবেন। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আমি এম. এ. পাস করি। এলেন উনি ঠিকই, কিন্তু ফিরে যাবার জন্যে নয়, এগিয়ে যাবার জন্যে। এগিয়ে যাবেন দেশের অভ্যন্তরে, যেখানে মাটি অপেক্ষা করছে মানুষের। আর আধুনিক বিজ্ঞানের।”

ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা হলো।

আরেক দিন সেই প্রসঙ্গ উঠল. কেন সে চাকরি নিল, দেশে

ফিরল। দীপক বলল, "তা হলে একটা গল্প বলতে হয়। বলব এক দিন। আজ শুধু আভাস দিয়ে যাই। চাকরি নিয়েছিলুম একটি মেয়েকে সুখী করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের সম্পর্ক বদলে গেছে, চাকরি রাখার তেমন কোনো দরকার নেই আর। ছুটি পাওনা হলেই বিলেত চলে যাব, একটা কিছু যোগাড় করে এটাতে ইস্তফা দেব।"

"ওমা! তাই নাকি। সেখানে হৃদয় রেখে আসনি তো!"

"এটা আরো গোপনীয়।"

"বুঝেছি। আছে কেউ একজন। বিরহে কাতর বোধ করছ না?

"করলে উপায় কী! মানুষ যা চায় তা পায় না, যা পায় তা চায় না। এই তো নিয়ম! তোমার জীবনেও কি এই নিয়ম খাটছে না, দিদি?"

আকাশে মেঘ করে আসার মতো ছায়া ঘনিয়ে এলো তাঁর মুখে। বললেন, "থাক্, আমিও আরেক দিন বলব। এখন শুধু আভাসটুকু দিই। এক একটা স্টেশন আছে যেখানে আপ ট্রেন ডাউন ট্রেন দুটোই এক সঙ্গে থামে। তার পর আপ ট্রেন একদিকে চলে যায়, ডাউন ট্রেন আরেক দিকে। মনে করো ট্রেন দুটো থামল তো থামল, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা। সেই এক সঙ্গে থাকাটা কি যা চেয়েছি তা পাওয়া?"

"না, তা নয়।"

"কেন নয়? ভেবে দেখ। আমেরিকায় উনি অল্পবয়সে

পালিয়ে যান। আমি ওঁর বাল্য সহচরী, আমি উৎসাহ দিই। বলি, ফিরে এসে আমাকেও নিয়ে যেয়ো কিন্তু। সে দেশে উনি উনিশ বছর ছিলেন। সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে লেখাপড়া শিখে অধ্যাপক হন। মাঝখানে একবার এসেছিলেন বিয়ে করতে, কিন্তু তখন আমার মা বেঁচেছিলেন, বিধবা মা আমার বিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র সন্তানের মায়া কাটাতে পারলেন না। আমার মতো বিরহের সাধনা কবে কে করেছে ?”

দীপক বলল, “সত্যি। সীতাও অত দিন করেননি।”

“সীতার মতো আমাকেও অপবাদ সইতে হয়েছে। কিন্তু সে কথা যাক। উনি ফিরলেন এই কলেজের প্রিন্সিপাল পদ পেয়ে। পাঁচ বছরের অঙ্গীকার। তাও সহ্য হতো আমার। কিন্তু ডাউন ট্রেন এখানে পাঁচ ঘণ্টা থেমে কি করবে, জানো ? আরো ডাউনে যাবে। কোনো এক তেপান্তরের মাঠে উপনিবেশ পত্তন করা হবে। সেই তার টারমিনাস। আপ ট্রেন বেচারীর প্রাণান্ত। সে গ্রামের মেয়ে। গ্রাম্য জমিদার বাড়ীতে মানুষ। বাইশ তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া ছিল। গ্রামের লোক যা তা রটাত। প্রাইভেট পড়তে পড়তে বি. এ. পাস করল। তারপরে তার বিয়ে। বিয়ের পরে আরো দশ বছর কাটল, তার সবটা গ্রামে নয়। বেশীর ভাগ কলকাতায়। আপ ট্রেন মনে মনে ঠিক করে রেখেছে কলকাতা একটা জাংশন মাত্র। টারমিনাস হচ্ছে আমেরিকার মিশিগান।”

দীপক নীরবে শুনছিল। নীরবে ভাবতে লাগল।

"না, আমার কোনো সান্ত্বনা নেই, দীপক। বৃথা সান্ত্বনা দিতে যেয়ো না। কলকাতায় আমেরিকা-ফেরত সমাজে মিশতুম, আমেরিকান সমাজেও মিশতে চেষ্টা করতুম। সব রকমে তৈরি হতুম স্বামীর সঙ্গে খাপ খেতে, বিদেশের আওতায়। কোন কাজে লাগল ওটা! এখন তো নতুন করে খাপ খাওয়াতে হবে, উপনিবেশের আবেষ্টনে। পারব কেন?"

"সত্যিই তো। পারবে কেন!" দীপক মুখ ফুটে জানাল।

"এর কি কোনো উপায় নেই?"

সর্বাধিকারী একদিন "চামারি"তে বেড়াতে এসেছিলেন। একটু কাজও ছিল। পাঁচশো বিঘার একটা প্লট পাচ্ছেন, কিন্তু শরিকে শরিকে গোলমাল। একমত হয়ে ওরা লিখে দেবে না। কলেক্টর ডাউনিং সাহেব যদি একটু হস্তক্ষেপ করেন। যদি একটু চাপ দেন।

দীপক বলল, "আচ্ছা, আমি ডাউনিংকে বলে দেখব। আপনিও বলতে পারেন।"

"তা কি হয়! আমার এই খদ্দরের পাঞ্জাবী দেখে সাহেব ক্ষেপে যাবে। জন বুলের সামনে লাল ন্যাকড়া। কয়েক বার সাক্ষাৎ করতে হয়েছে কলেজের কাজে। তেমন সাড়া পাইনি। আমি যে আমেরিকায় ছিলুম এও আমার দু'নম্বর অপরাধ। কবে ওরা ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সে অপমান এখনো ইংরেজের মনের পরতে পরতে।"

"ফ্যাসাদ!" দীপক বলল, "যদি কিছু না মনে করেন আপনাকে একটা ঘরোয়া কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"কী কথা ?"

"আপনি কি উপনিবেশ গড়তে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ডেকে আনবেন ?"

"কেন ? কেন ? কেউ বলেছে নাকি অমন কথা ?"

"না। বলেনি। তবে অনুমান করা কঠিন নয়। আপ ট্রেন আর ডাউন ট্রেন এক স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে দু'টোই। যতক্ষণ কোনোটাই চলছে না ততক্ষণ ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন উঠছে না। যেই একটা চলতে আরম্ভ করল অমনি ছাড়াছাড়ি আসন্ন হলো। আপনি উপনিবেশের দিকে ইঞ্জিন চালাতে গেলেই দিদির ইঞ্জিন কলকাতার দিকে যাবে।"

সর্বাধিকারী অতটা চিন্তা করেননি। ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, "যে জিনিসটি তৈরি করব বলে আমি আমেরিকায় কাছে পাঠ নিলুম যে জিনিসটি তৈরি না করে আমি আবার আমেরিকায় ফিরে যাই কী করে ? কচ যেমন মৃতসঞ্জীবনী এনেছিল, তেমনি আমিও এনেছি এই উপনিবেশের মন্ত্র। আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত তোমার দিদির। বছর দশেক পরে ওকে আমেরিকায় নিয়ে যাব, কথা দিচ্ছি।"

"বছর দশেক! তত কাল সে বেচারিকে মাটি কাটতে, ঘাস কাটতে, ফসল কাটতে হবে। সাঁওতাল মেয়েদের মতো। কেমন, এই তো আইডিয়া ?"

"হাঁ, সাঁওতাল মেয়েদের মতো। কোনো কাজই নিছক মেয়েলি বা নিছক পুরুষালি নয়। সব কাজে সবাইকে হাত লাগাতে হবে। সুধা যদি ঘাস কাটে আমিও তো বাটনা বাটব,

কুটনো কুটব। ভদ্র ঘরের মেয়েরা মরেছে কর্মবিভাগ মেনে নিয়ে। সাঁওতাল মেয়েরা বেঁচে আছে, বাঁচবেও আরো কয়েক হাজার বছর, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের মতো খেটে, নেচে, বেড়িয়ে, ঘুরে। তা বলে তাদের নারীত্ব চলে যায়নি। মাতৃত্বও রয়েছে।”

সুধাদিকে একথা শোনাতেই তিনি বললেন, “বাপের বাড়ীতে আমাকে কেউ বাটনা বাটতে দিত না। যদি হাতে কড়া পড়ে যায়। যদি হাত কঠিন হয়ে যায়। এই সেদিন অবধি আমার হাত মখমলের মতো নরম ছিল, দীপু। শ্বশুর বাড়ী এসে বাটনা বাটা আর বাসন মাজা আর খদ্দর কাচা আর ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া সবই করতে হচ্ছে আমাকে। এ হলো উপনিবেশের জন্যে ট্রেনিং। দেখ না, হাত দুটো কী হয়েছে! যেন বাগদীর মেয়ের হাত। এ হাতে চড়টা চাপড়টা মানায়। স্বামীদের মনের সুখে কিলোয় ওরা।”

দীপক তাঁর ভাব দেখে হেসে উঠল। কিন্তু হাসির কথা নয়।

তাঁদের দু'জনের মাথার উপর যেন খড়্গ ঝুলছে। যে কোনো দিন ছাড়াছাড়ি ঘটে যেতে পারে। উনিশ বছরের বিরহের পর তিনটি বছরও কাটেনি। এরই মধ্যে মিলনের সুখ বাসি হতে বসেছে। রাম সীতার জীবনও তো অনেকটা এই রকম হয়েছিল। এর পরে আসছে একজনের অরণ্যবাস, আরেকজনের রাজধানী অধিষ্ঠান। তবে উল্টোপাল্টা।

সে তার নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিল। সেও তো তৃতীয় একটি ট্রেন। একই স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার

ভবিষ্যৎ কেমনতর হবে কে জানে ? সেও কি রক্ষিতের মতো সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে যাবে ? সেখান থেকে মহকুমায় ? তা যদি হয় তবে সর্বাধিকারীর সঙ্গে তারও মিল আছে। সেও ডাউন ট্রেন। উপনিবেশ গড়বে না, কিন্তু গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশবে। তাদের যত রকমে পারে সাহায্য করবে।

আর তা যদি না হয় ? যদি ইংলণ্ডে ফিরে যায় ? যদি ওখানে থেকে যায় ? তা হলে সে আপ ট্রেন। দিদির সঙ্গে তার মিল আছে।

"কিছুই বুঝতে পারছিনে, দিদি।" সুধাদির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে, "আমি কি ডাউন ট্রেন, না আমি আপ ট্রেন ?"

"কেন ? তোমার তো হৃদয় পড়ে আছে ওখানে। ফিরে না গিয়ে তোমার গতি আছে! তুমি আপ ট্রেন হয়ে এসেছ, ডাউন ট্রেন হয়ে যাবে। তুমি মাঝ রাস্তা থেকে মোড় বদলাবে। তুমি ভাগ্যবান। কেন তা হলে তোমার আন্‌মনা ভাব ?"

"ঐ যে বললুম। কিছুই বুঝতে পারছিনে। ওর চেয়ে আর কত স্পষ্ট করে বলব ?"

দিদির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চোখ নামিয়ে বলল, "আমার হৃদয় বলে কিছু থাকলে তো ? অনেক সময় মনে হয় আমি হৃদয়হীন। ভালোবাসা যেমন জোয়ারের মতো আসে তেমনি ভাঁটার মতো চলে যায়। আমি অসহায়ের মতো দেখি। হৃদয়ে ধরে রাখতে পারিনে। হৃদয়টা তেমন গভীর নয়।"

দিদি হকচকিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে একান্ত নিঃস্পৃহভাবে বললেন, "তোমরা

পুরুষেরা কি সবাই একছাঁচে ঢালা? এখানে একজনকে ভালোবাসলে, ওখানে গিয়ে তাকে ভুলে গেলে। ওখানে আরেকজনকে ভালোবাসলে, এখানে আসতে না আসতে তাকে ভুলে যাবার যোগাড়। এর সঙ্গে আবার জোয়ার ভাঁটার উপমা। তুমি দীপক অন্য রকম হবে ভেবেছিলুম ছি ছি। তুমিও!"

এবার স্তব্ধ হবার পালা দীপকের।

৩

আত্মসমর্থনের জন্যে তাকে খুলে বলতে হলো তার জীবনের আখ্যান। তার উত্তরে সুধাদি বললেন তাঁর।

দু'জনে দু'জনের জন্যে দুঃখিত। স্থির হলো এই নিয়ে আর একটি কথাও না। যা মনের অতলে ছিল তা মনের অতলেই থাক।

কিন্তু এর পরে তাঁর ভাবান্তর লক্ষিত হলো। তাঁকে আরো বিমর্ষ, আরো ছায়াচ্ছন্ন মনে হতে লাগল। তা দেখে দীপক বলল তাঁর স্বামীকে, "বরেণ্যদা, আপনি যদি পারেন তো সস্ত্রীক আমেরিকায় চলে যান। না পারেন তো কলকাতায় কাজকর্ম খুঁজে নিন। এখানে দিদির আর ভালো লাগছে না।"

"ওদিকে জমিটা যে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল বলে। ডাউনিং যথেষ্ট ভদ্রতা করেছেন। ওটা যদি হাতছাড়া হয়?"

"ওসব এখন বন্ধ থাক। না গবর্নমেন্ট না কংগ্রেস কেউ

যে এখন ওর দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। দেশ প্রস্তুত হয়নি। আপনি ব্যর্থ হতেন, যদি হাত দিতেন।"

"আমি দেখিয়ে দিতে পারতুম যে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজে বিরাট উপনিবেশ গড়ে উঠতে পারে। আমাকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত তোমার দিদির।"

"দেবেন হয়তো এক দিন। কিন্তু আপাতত নয়। ওঁর উপর ইচ্ছা খাটাতে যাবেন না। তাতে ফল খারাপ হবে। আমার ভয় হচ্ছে একটা ছাড়াছাড়ি না ঘটে যায়।"

কয়েক সপ্তাহ পরে ডাউনিং বললেন দীপককে, "কী রকম লোক হে, কাস্টগীর, তোমার ঐ সার্বাডিকারী! ওর জন্যে আমি এত করলুম, এখন বলছে কিনা জমি চায় না। এটা কি দাম কম দেবার ফিকির না আর কিছু? লাট সাহেব বাঙালী মধ্যবিত্তদের জন্যে ঐ ধরনের স্কীম বিবেচনা করতে ইচ্ছুক। সার্বাডিকারী সে ভার নিলে মোটা গ্রাণ্ট পাওয়া যেত। কিন্তু এসব আমেরিকান-শিক্ষিত ভদ্রলোকদের উপর আমার আস্থা নেই, যাই বলো। সার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ইজ দি ম্যান।"

বিমর্ষ মানুষের সংখ্যা আর একটি বাড়ল।

সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা হলে তিনি আর নকশা বাড়িয়ে দেন না দেখতে। জমির কথা, পাম্প বসাবার কথা, জল-নিকাশের কথা, মলনিকাশের কথা পাড়েন না। গুম হয়ে বসে থাকেন। ধ্যানস্থ বলেও ভ্রম হয় না। ভারতের ভবিষ্যৎ তাঁর তৃতীয় নয়নগোচর নয়।

"সুধাদি", দীপক বলে, "এ যে উল্টো বিপত্তি হলো। তুমি একটু নরম না হলে তো চলবে না। লাট সাহেব পর্যন্ত আগ্রহ দেখাচ্ছেন, আর ঘরের মানুষের সায় নেই!"

"লাট সাহেবকে তো বারো মাস ত্রিশ দিন তেপান্তরে গিয়ে থাকতে হবে না। ম্যালেরিয়ায় আর কালাজ্বরে ভুগতে হবে না। লাট সাহেবের কী! গৌরী সেনের টাকা ধরে দিলেই হলো। আমি মরি গোরুর মতো খেটে!"

মিটমাটের লক্ষণ নেই। যে যার নিজের গোঁ ধরে বসে আছে।

রেকর্ড বাজানোর উৎসাহ মিইয়ে এসেছিল। যেমন সুধাদির তেমনি দীপকের। ওর নিজের জীবনে একটা সঙ্কট চলছিল। যে সমাজে তাকে মিশতে হয় সে সমাজ তার একঘেয়ে লাগছিল। ওটা একটা সমাজই নয়। উপরের দিকের কয়েকটি পরিবার, তাদের স্থিতি আজ এখানে কাল সেখানে। সাধারণের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দেশের মাটির উপর তারা আছে টাবের গাছের মতো। টাবটাকে যখন যেখানে খুশি সরাও, গাছও সরবে। এই ক'মাসের মধ্যেই জজ বদলি হয়ে গেছেন। ডাউনিং ছুটি নিচ্ছেন। এস. পি. বদলি হবেন শোনা যাচ্ছে। সিভিল সার্জন তো গেলে বাঁচা যায়। লোকটা নার্স নিয়ে ঘোরে।

সমাজের তো এই দশা। কাছারির কাজও কি তৃপ্তি দিচ্ছে! অত্যন্ত নীরস যত ডিপার্টমেণ্ট। ট্রেজারি, তৌজি, মুন্‌শীখানা, নেজারত। মামলা মকদ্দমা জেল জরিমানা।

অদ্ভুত সব লোক। উকীল মোক্তার রেভিনিউ এজেন্ট, সেরেস্তাদার নাজির পোদ্দার। দারোগা, জমাদার, কোর্টবাবু, পেশকার। জেলর, জেল ওয়ার্ডার। কী করে সে এদের একজন হবে! মহকুমায় গেলে এরাই তো হবে তার সমাজ!

তা হলে কি ইংলণ্ডেই ফিরে যাবে? সেখানে একটা কাজ জোটাতে পারলে জীবিকার সঙ্গে যোগ দেবে জীবন। সে শুধু প্রাণধারণ করবে না, প্রাণভরে বাঁচবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের আসল সম্বন্ধটা যে শত্রুতা তা দিন দিন প্রত্যক্ষ হচ্ছিল। ইংলণ্ডে কি সে আগের মতো আনন্দ পাবে? স্থানে ফিরে যাওয়া তো কালে ফিরে যাওয়া নয়। সে কাল আর নেই। যে স্থানে সে ছিল সে স্থানে গেলে দেখবে যে কালে সে ছিল সে কাল কোথায় হারিয়ে গেছে। ফুলের গন্ধের মতো।

আর প্রেম! অন্তরে তেমন আবেগ বোধ করছে না। প্রেম নয়, প্রীতি। সম্পর্ক ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। টান যদি আপনা হতে শিথিল হয়ে যায় তা হলে ফুল ঝরে পড়ে, ফল খসে পড়ে। প্রেমের বেলা কি অন্য নিয়ম?

সুধাদির ওখানে কয়েক সপ্তাহ কামাই হয়েছিল। এক দিন দেখে তিনি সশরীরে তার এখানে উপস্থিত। চমকে উঠল দীপক। ব্যাচেলরের সংসার। সব অগোছালো, সব এলোমেলো। সে একসঙ্গে তিন চারটে কাজ করতে ভালো-বাসে। বিছানায় বইকাগজ, টেবিলে টাই কলার, চেয়ারে

কোট। দিদি তা লক্ষ করে অবাক। সেও তেমনি অবাক দিদিকে দেখে।

আরো বিবর্ণ, আরো পাণ্ডুর হয়েছে তাঁর চেহারা। বনিবনা যে হচ্ছে না তার বিজ্ঞাপন। কী করে এঁরা এক স্টেশনে থামবেন অনন্ত কাল—আপ ট্রেন আর ডাউন ট্রেন! চলতে হবে এক দিকে না এক দিকে। কিন্তু কোন্ দিকে? আপ না ডাউন?

"দীপক, তুমি আসা বন্ধ করলে কেন? অপরাধ করেছি?"

"না, সুধাদি। অপরাধ কিসের? আমার আসা হয়ে ওঠে না এমনি নানা কারণে। আমিও তো আপনারই মতো সঙ্কটে পড়েছি।"

"তোমার সঙ্কট এমন কিছু নয়। ও নিয়ে অত ভাববার কী আছে!"

"না থাকলে কি আমি অকারণে ভাবি? এসপার কি ওসপার আমারও তো চাই। আমি যে তৃতীয় ট্রেন। আমার থামার মেয়াদ এক বছর!"

দিদি বললেন, "আমার কী মনে হয়, জানো? তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার সিদ্ধান্ত জড়িয়ে গেছে। তুমি যদি আপ ট্রেন হও আমি বাঁচব। তুমিও যদি ডাউন ট্রেন হও আমার বাঁচা দুর্ঘট।"

দীপক শিউরে উঠে বলল, "ও কী কথা, সুধাদি! তুমি বাঁচবে না কেন?"

"তা কি তুমি জান না? এ রকম একটা টেনসন নিয়ে কেউ

বাঁচে। তোমরা দু'জনেই যদি এক দিকে যাও আমাকে ফেলে যাবে তো! নয়তো টেনে নিয়ে যাবে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অমন করে কি বাঁচা যায়, দীপক!"

কী আশ্চর্য! সে তার নিজের মনের মতো করে বাঁচতে পারবে না? তাকে বাঁচতে হবে আরেক জনের মনের মতো করে, আরেক জনকে বাঁচাতে?

"আমাকে তুমি কী করতে বলো, সুধাদি?"

"তা কি তুমি বোঝ না? তুমি যদি আপ ট্রেন হও তা হলে আমিও আপ ট্রেন হতে জোর পাই। আমার মনের জোর নির্ভর করছে তোমার বিলেত ফিরে যাবার উপরে। হয়তো আমার যাওয়া হবে না, তবু আমি আশা নিয়ে বাঁচব। অন্ততপক্ষে কলকাতা যাব। একটা চাকরি কি সেখানে পাব না?"

"সুধাদি," দীপক আমতা আমতা করে বলল, "আমার বোধ হয় খুব শীগগির বিলেত যাওয়া হবে না। ও দেশের সঙ্গে এ-দেশের সম্পর্ক দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠছে। ওখানে গেলে আমি হালে পানি পাব না। আগে তো রাজনীতির বিরোধ মিটুক। তত দিন তা হলে আমি করব কী, সুধাদি! আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না। আমি ভাসমান তৃণ। স্রোত আমাকে যে দিক ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমি সেই দিকে যাব। রক্ষিতের মতো সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে। তার পর মহকুমায়। শুনেছ, রক্ষিতকে মানিকগঞ্জ দিয়েছে?"

"শুনেছি। অজ পাড়া গাঁ।" দিদি উদাস সুরে বললেন,

“তোমাকে হয়তো দেবে মাদারিপুর। ভাসতে ভাসতে কোন্ ঘাটে যাবে তুমি, যাও। কিন্তু আমাকে যে এক দিন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নয়তো এইখানেই পড়ে থাকতে হবে আরো দু'টি বছর। যদি না উনি ছুটি নিয়ে উপনিবেশ গড়তে যান।”

“ছুটি নিয়ে,” দীপক পরামর্শ দিল, “আমেরিকায় কি কলকাতায় কোথাও এক জায়গায় যান, যেখানে দু'জনে এক-সঙ্গে থাকতে পারবেন। তার পর যদি উপনিবেশের পরিকল্পনা কাজে লাগে দু'জনেই একসঙ্গে কাজ করবেন। যেখানেই যান দু'জনায়। যে কাজেই হাত দিন দু'জনায়।”

বিদায় নিতে গিয়ে দিদি বললেন, “ধন্যবাদ। যে মানুষ সব জেনেও কিছুই জানে না তাকে আমার জানাবার কী আছে! চলি তা হলে।”

দিন কয়েক পরে রক্ষিত এলেন চার্জ দিয়ে মানিকগঞ্জ যাবার মুখে। খাস্তগীরের সঙ্গেই উঠলেন। দুই বন্ধুতে একশো রকম কাথাবার্তা। তারই এক ফাঁকে সর্বাধিকারীর প্রসঙ্গ। রক্ষিত জানতে চাইলেন সে ভদ্রলোকের কি চাকরি নিয়ে টানাটানি? খাস্তগীর বলল, না, তা নয়।

“তা হলে তাঁকে অমন মনমরা দেখলুম কেন?”

“শুধু কি তাঁকে?”

“হাঁ, তাঁর স্ত্রীকেও।”

“এখানে আর তাঁদের ভালো লাগছে না। কিন্তু কোথায় যাবেন তা নিয়ে দু'জনের দু'দিকে টান। টানাটানি যদি বলেন ওই নিয়ে টানাটানি।”

"ওহ্। তাই নাকি? যাক, ওটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। একজনকে নত হতে হবে। নয়তো একটা মধ্যপন্থা বেরিয়ে পড়বে।"

"আমারই তাই মনে হয়। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয়, তবে এর মধ্যে আমাকেও টানতে চান সুধাদি।"

রক্ষিত যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "আপনাকে!"

"হাঁ। তাঁর মনে একটা ধারণা জেগেছে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে আমার সিদ্ধান্তের উপর। আমি যেন একটা গ্রহ কি নক্ষত্র। আমার গতিপথের উপর তাঁর লক্ষ।"

অবাক হলেন রক্ষিত। আর একটু খোলসা করতেই তিনি বললেন, "বুঝেছি, কিন্তু এটা ভালো নয়। আপনার ওপর-ওয়ালারা শুনলে আপনাকেই দোষ দেবে। সামাজিকতা করতে বলেছিলুম, পারিবারিকতা করতে তো বলিনি। চাকরিতে আপনার বদনাম না হয়ে যায়।"

"কেন? কেন?" দীপক ক্ষুব্ধ হয়েছিল। চাকরি নিয়েছে বলে কি সে ইচ্ছামতো মিশতে পারবে না? এ কী অত্যাচার!

"অলিখিত নিয়ম। কারণ আছে নিশ্চয়। আমি আপনার এক বছরের সিনিয়র। আমার কর্তব্য। আমি সতর্ক করে দিলুম।"

চাকরি যতদিন করবে তত দিন সুনাম নিয়ে করবে। এ সঙ্কল্প দীপককে সতর্ক করল। এর দরকার ছিল। ছোট একটা শহর, কে কোথায় যায় না যায় সকলের নজরে পড়ে। প্রিন্সিপালের স্ত্রী "চামারি"তে এসেছিলেন এটা কেমন করে

রাষ্ট্র হয়ে গেল। তার উপর রং ফলিয়ে সিভিল সার্জন রসিয়ে তুললেন ক্লাবের ব্রিজ খেলার আসর।

তখন ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিল দীপক। ক্লাবে ইস্তফা দিতে যাচ্ছিল, তার বন্ধু এ. এস. পি. তার হাত চেপে ধরলেন। ওতে আরো বেশী জানাজানি হয়ে যাবে, কমিশনার পর্যন্ত গড়াবে। কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট খারাপ হবে।

এক একবার রোখ চাপে চাকরিটাই ছেড়ে দিতে। মানুষ ন্যায্য মেহনত করবে, মজুরি পাবে, তা নয়, কার সঙ্গে কাশবে কার সঙ্গে হাঁচবে তাও তোমরা বেঁধে দেবে পাঁচ জনে মিলে। নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে না মানুষ!

হঠাৎ এক দিন সিভিল সার্জন কল্ করলেন। "কাস্টগীর, ইউ আর এ বেবী। কে তোমাকে কী বলেছে, তুমি ক্লাবে আসা ছেড়ে দিলে তা বলে! না, না, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কারুর কোনো অভিযোগ নেই। ফরগিভ য়্যাণ্ড ফরগেট।"

লোকটাকে যত বড় দুর্জন বলে মনে হতো তত বড় দুর্জন নয়। বয়সে অনেক বড়। পাকা আমটির মত চেহারা। ভিতরে একটা স্নেহের ফল্গু ধারা ছিল। দীপক সে ধারায় সিক্ত হলো। আবার ক্লাবে যাওয়া আসা করতে লাগল।

অবশেষে একদিন দিদির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এলো। নৈশ ভোজন। গিয়ে দেখলো আরো কয়েকজন অতিথি সমাগত। কেবল পুরুষ না, মহিলাও। বিলিতী ধরনে ভোজ। লক্ষ করল সর্বাধিকারীর পরনে স্যুট।

খানার মাঝখানে কে একজন রসিক প্রশ্ন করে বসলেন, "ডক্‌টর সর্বাধিকারীর কি আজ জন্মদিন না পরিণয়-সাম্বৎসরিক ?"

"না, তেমন কিছু নয়।" প্রিন্সিপাল একটু হেসে বললেন। "আমাকে নোটিস দেওয়া হয়েছে স্থানত্যাগ করতে। আমার প্রভাব বিদ্যার্থীদের পক্ষে অনিষ্টকর।"

"সে কী, মশাই!" অভ্যাগত হাত গুটিয়ে রইলেন। "আপনি এ কলেজের জন্যে যা করেছেন তার তুলনা হয় কখনো! ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেছে কত! আয় বেড়ে গেছে কত! কে আপনাকে না চায়, শুনি!"

"কী করে জানব! আমি তো গভর্নিং বডির ভিতরের খবর রাখিনে। মিটিংয়ে দেখলুম সকলেই একমত যে আমার এখানে থাকা সাধারণের স্বার্থে নয়। ওঁরা আমাকে তার জন্যে কিছু ক্ষতিপূরণও দিতে রাজী। দু'বছরের না হোক ছ'মাসের মাইনে একসঙ্গে অগ্রিম। ভেবে দেখলুম মন্দ কী! আমেরিকা যখন পালাই তখন তো পকেটে ছ'দিনের খোরাকও ছিল না। কী বলো, সুধা!"

দীপক লক্ষ করল স্বামীস্ত্রীর ভাব হয়ে গেছে। দিদি বসেছেন রাজরানীর মতো টেবলের এক প্রান্তে। অপর প্রান্তে তাঁর কর্তা।

অভ্যাগতরা সকলে হায় হায় করতে লাগলেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে শহরের সর্বত্র হায় হায় সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকল। কিন্তু গভর্নিং বডি তাঁদের নোটিস প্রত্যাহার করলেন না। ছাত্র

ধর্মঘট তখনকার দিনে রেওয়াজ হয়নি। যারা করতে পারত তারা আইন অমান্য আন্দোলন করে জেলে গিয়ে বসে আছে। কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদী বলে সন্দেহভাজন হয়ে আটক রয়েছে।

দিদি আরেক দিন ঘোড়ার গাড়ী করে দীপকের বাসায় এসেছিলেন। এই কথাটি বলতে যে, "তোমার কাছে আমি ঋণী।"

"আমার কাছে! ঋণী! কী যা তা বকছ, সুধাদি!"

"গভর্নিং বডি কেন নোটিশ দিল, জানো না বুঝি?"

"কী করে জানব? আমি তো মেম্বর নই।"

"তোমার সঙ্গে আমার মেলামেশার জন্যে। এক হাতে তালি বাজে না। দু'টো হাত লাগে। তুমি একটা হাত, আর আমি একটা।"

তাঁদের দু'জনের প্ল্যান তখনো ঠিক হয়নি। আপাতত কলকাতা। তার পর কে জানে কোথায়! তবে আর মফঃস্বল শহরে নয়। উপনিবেশের কল্পনা মাথা থেকে যায়নি, তবে হঠাৎ এমন একটা ধাক্কা খেয়ে বরেণ্যদার চৈতন্য হয়েছে যে দিন আগত নয়। এখনো এটা ত্রেতা যুগ। ত্রেতা যুগের অযোধ্যা।

(১৯৫৪)

বজ্র আঁটুনি

আপনি কি সুদীর্ঘ পনেরো বছর বাদে ভারতে ফিরছেন? আপনাকে কি মাত্র পনেরো দিন পরে ভারত ছেড়ে যেতে হবে? কলকাতার জন্যে কি আপনার হাতে তিনটি দিনের বেশী সময় নেই? তার থেকে একটি দিন কি আপনি টেলি-ফোনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে নষ্ট করেছেন? আর ট্যাক্সি করতে গিয়ে মীটারের কারসাজিতে টাকাও কি বরবাদ হয়েছে আপনার? তবে কবে কেমন করে কোথায় আপনার বন্ধুজনের সঙ্গে আপনার দেখাশোনা হবে, কথাবার্তা হবে?

অমন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন কেন? কাল সকালের প্লেনেই দার্জিলিং চলে যান। বিকেলের দিকে চৌরাস্তায় গেলে দেখবেন তামাম কলকাতা শহর সেখানে উঠে এসেছে। অর্থাৎ কলকাতা বলতে যেসব ভাগ্যবানকে বোঝায়। টেলিফোন না করে, ট্যাক্সি না করে এক দিনেই আপনি পঞ্চাশ জন বন্ধু বন্ধুনীর দর্শন পাবেন। অধিকন্তু এই বিশ্রী গরমটাও এড়াবেন। আপনার মনে হবে আপনি ইউরোপেই আছেন।

ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছিল সুমন্ত হোমচৌধুরীর জীবনে। বেচারাকে বদলি করেছিল রোম থেকে টোকিও। ফরেন সার্ভিসে নাম দিয়ে পুরাতন স্বাধীনতাকর্মীর এই দুর্ভোগ। মাত্র

পনেরোটা দিন ভারতে কাটাবার মেয়াদ। তার থেকে দিল্লীতেই কয়েকদিন কাবার হলো নতুন রাজা উজিরদের সঙ্গে দহরম মহরম করে। কয়েক দিন গেল ময়মনসিংহে বুড়ো বাপ মাকে দেখতে। তাঁরা পাকিস্তান থেকে নড়বেন না, মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। এ ছাড়া দামোদর ভ্যালি ইত্যাদি কয়েকটা দৃশ্য না দেখলে নয় আধুনিক ভারতের নাগরিকমাত্রের, না দেখলে বিদেশীদের প্রশ্নের উত্তরে বলবে কী!

চৌরাস্তায় যে দোকানগুলো আছে সুমন্ত তার একটাতে গিয়ে গাইড বুক ও মানচিত্র কিনল। বেরিয়ে এসে বেঞ্চিতে বসে পাতা ওলটাচ্ছে এমন সময় তার কানে এলো, "এক্স্‌-কিউজ মী। আপনি কি হোমচৌধুরী?"

সুমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করে বলল, "আমিই সেই। কিন্তু আপনাকে তো—"

"চিনতে পারলেন না!" ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত ও আহত হয়ে বললেন, "তা হলে লক্ষ রাখুন। কে না চেনে আমাকে!"

সুমন্ত লক্ষ করল, যে যায় সে টুপি খুলে বা টুপিতে হাত ছুঁইয়ে অভিবাদন জানায় তার আলাপীকে। তাদেরই মুখে শুনল তাঁর নাম চ্যাটার্জি। তখন তার একটু একটু করে স্মরণ হলো। কোথায় তাঁর সঙ্গে পরিচয়। কবে। এ তার ভারী অদ্ভুত লাগছিল যে দেশ স্বাধীন হলেও চাটুজ্যে সেই চ্যাটার্জি। ইংরেজ গেছে, তবু নামগুলি ইংরেজীতরো।

"রানা চ্যাটার্জি! ওয়েল, আই নেভার!" সুমন্ত তাঁর দুই হাত ধরে নাড়া দিল।

"তা হলে চিনতে পেরেছেন ঠিক। আমিই সেই পুরোনো পাপী। আঃ! পারীর সেই দিনগুলো এখনো মনে জ্বলজ্বল করে। আচ্ছা, ওই রাশিয়ান রেস্তোরাঁটা কি এখনো ওইখানেই আছে?"

"ওইখানেই আছে।"

"আর ওই ছুঁড়িগুলো?"

"ছুঁড়িগুলো বুড়ী হয়ে গেছে। তাদের জায়গায় নতুন ছুঁড়ি এসেছে।"

চ্যাটার্জি হাহুতাশ করে বললেন, "হ্যাট রিমাইণ্ডস্ মী। আমিও যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আপনাকে দেখলে কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে প্রায় চল্লিশ। আপনি এখনো যুবক। হবে না কেন? শীতের দেশে থাকলে যৌবন অনেক দিন থাকে। হাঁ, যৌবনের জন্যেও একরকম রিফ্রিজেরেটর চাই। তা আপনি আজকাল কোথায়?"

সুমন্ত বলল, "রোম থেকে টোকিওর পথে। আপনাকে তো সবাই খাতির করে দেখছি। একটু তদ্বির করে দিন না আমার বদলিটা খারিজ করিয়ে। কৃতজ্ঞ হব।"

চ্যাটার্জি বললেন, "আসুন আপনাকে আলাপ করিয়ে দিই।" এই বলে তাঁকে নিয়ে গেলেন উল্টো দিকের একটি বেঞ্চিতে। সেখানে বসেছিলেন দু'জন মহিলা।

"শ্রীহোমচৌধুরী। শ্রীযুক্তা চ্যাট্যার্জি। আর ইনি হলেন তাঁর বান্ধবী শ্রীযুক্তা গুপ্তা। দার্জিলিং-এই থাকেন।"

চারজনে বসে গল্প করা হলো। শ্রীযুক্তা চ্যাটার্জি জানতে

চাইলেন পনেরো বছর পরে দেশে ফিরে নতুন কী দেখছেন। সুমন্ত বলল, "নতুনের মধ্যে এই দেখছি বিলিতী পোশাক সকলেরই গায়ে। মেয়েদেরও। তবে মেয়েরা তার উপর এক-খানা শাড়ী জড়িয়ে 'ভারতীয়' এই বিভ্রম সৃষ্টি করেন। আর দেখছি মিস্টার ও মিসেস এ জমানায় জলচল নয়, তার বদলে শ্রী ও শ্রীযুক্তা।"

হাসাহাসি পড়ল। চ্যাট্যার্জি বললেন, "এই তো সেদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল রাজভবনে যাঁরা লাঞ্চনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী ও শ্রীযুক্তা এইচ. পি. চ্যাটার্জি। আপনি রাজভবনে কল্ করেছেন ? কর্তব্য।"

সুমন্তর মুখ শুকিয়ে গেল। প্রজাতন্ত্রী ভারতের রাজভবনে প্রাক্তন স্বাধীনতাকর্মী সুমন্ত হোমচৌধুরীর আসন যত সব নকল ইংরেজের সঙ্গে। আবার এই দুঃসহ গরমে কোটের গলা বন্ধ করে মেকী দেশীয়তা জাহির করতে হবে।

এমন সময় চ্যাটার্জি তড়াক করে লাফ দিয়ে বললেন, "আসুন, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই। সার অশোকা রয়, সার বি. পি. সিং রয়, লেডী রানু মুকার্জি, হার হাইনেস দি মহ্যারানী অফ জয়পুর। এঁরাও এসেছেন।"

আলাপ পর্বের পর স্বস্থানে ফিরে সুমন্ত বলল, "শুনে-ছিলুম স্বাধীন ভারত থেকে উপাধি উঠে গেছে। তা তো মনে হচ্ছে না। দিল্লীতেও দেখলুম উপাধির মান আছে।"

একটু পরে আর চ্যাটার্জিকে ধরে রাখা গেল না। তিনি তাঁর স্ত্রীকেও টেনে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সুমন্তকে বিরক্ত

করলেন না। শ্রীযুক্তা গুপ্তাকেও না। ব্যাপার কী! স্বয়ং হিজ এক্সেলেন্সী পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এবার রাজদর্শন।

সুমন্ত তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলল, "কিছু মনে করবেন না। আপনাকে দেখে একজনকে আমার মনে পড়ছে। আপনি কি তার কেউ হন? নূপুর সেনের?"

পার্শ্ববর্তিনী মুচকি হাসলেন। "যদি বলি আমিই সেই?"

"তা হলে—তা হলে আমি সত্যি খুব খুশি হব।"

"বলব না। আমি তোমার উপর ভীষণ রাগ করেছি, সুমন।"

সুমন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বলল, "এ কি কখনো হতে পারে যে তুমি আর আমি এত ক্ষণ একসঙ্গে বসে থেকেও কেউ কাউকে চিনতে পারিনি!"

"আমি চিনতে পেরেছি গোড়া থেকেই। তুমিই চিনতে পারলে না।"

সুমন্ত বার বার মাফ চায় ও আফসোস জানায়। "নূপুর, তোমার সঙ্গে কথা না বলে আধঘণ্টা বাজে খরচ করেছি। এর ক্ষতিপূরণ হবে কী করে? কালকেই তো চলে যাচ্ছি। নূপুর, তোমাকে আমি ভুলে যাইনি। তোমার চেহারাও আমার মনে আছে। তবু কেন এ রকম হলো? বোধ হয় এইখানে তোমাকে প্রত্যাশা করিনি বলে।"

"আমিও কি তোমাকে প্রত্যাশা করেছিলুম এখানে? তবু দেখেই চিনেছি।"

সুমন্ত প্রস্তাব করল, "চল না একটু বেড়ানো যাক। আপত্তি আছে ?"

নূপুর রাজী হলো। চৌরাস্তা তখন লোকে লোকারণ্য। পদে পদে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় নূপুরের। সুমন্ত যাদের দেখতে চেয়েছিল কলকাতায় তাদের কারো কারো সঙ্গে মুখোমুখি হয় তার। চলতে চলতে তারা চৌরাস্তা ছাড়িয়ে জলাপাহাড় রোড দিয়ে চলল। সেদিকটাতে ভিড় কম। চেনা মুখের অভাব।

সুমন্ত জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কর্তাকে দেখছিনে যে ? তিনি কোথায় ?"

নূপুর রাগ করে বলল, "তোমার চোখ সত্যি খারাপ। আমার কপাল দেখে বুঝতে পারনি যে তিনি পরলোকে ?"

সুমন্ত শোক করে বলল, "আহা ! কী হয়েছিল ?"

নূপুর বলল, "ষাট বছর বয়স হয়েছিল। ব্লাড প্রেসার।"

সুমন্ত সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিল, নূপুর বলল, "সাত বছর কেটে গেছে।"

তার পর সুমন্ত জানতে চাইল, "ছেলেমেয়েদের এখানে রেখে পড়াচ্ছ বুঝি ?"

নূপুর বিষাদের সুরে বলল, "হয়ইনি।"

"হয়ইনি ! আহা !" সুমন্ত সমবেদনা জানাল।

এর পর নূপুরের পালা। সে বলল, "বিয়ে করেছ নিশ্চয়। তিনি কোথায় ?"

"তিনি ইহলোকে।" সুমন্ত গম্ভীর ভাবে বলল।

"তার মানে ?"

"তার মানে তিনি বেঁচে আছেন, কিন্তু—যাকগে, তোমার কি ওসব ভালো লাগবে শুনতে ? সেও তো প্রায় সাত বছর হলো।"

নূপুর বুঝতে পারছিল না কী হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে তার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুমন্তই অনহূত ভাবে বলল, "আমার কপাল দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বুঝবে যে আমি ঘরপোড়া গোরু। আমার ঘর পুড়ে গেছে। ঘরের লোকই ঘরে আগুন দিয়ে চলে গেল।"

নূপুর হায় হায় করে উঠছিল, সুমন্ত বলতে থাকল, "তামাশা দেখ, ওর যাতে কলঙ্ক না হয় তার জন্যে আমাকেই গায়ে পেতে নিতে হলো অপরাধের অপবাদ। পরিচিত মহলে মাথা হেঁট হয়ে গেল। স্ত্রীকে দোষী করলেও কি মাথা হেঁট হতো না। যাক, ও যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাকে বিয়ে করেছে। সুখী হয়েছে। দু'জন মানুষ অসুখী হওয়ার চেয়ে একজন সুখী হওয়া ভালো।"

সমবেদনায় নূপুরের চোখের পাতা ভিজল। সে বলল, "মেয়েদের আমি অত সহজে ক্ষমা করব না। বিশেষত সে যদি মা হয়ে থাকে।"

"হয়েছিল বৈকি। একটি মেয়ে। দুঃখ তো তারই জন্যে।"

"মেয়েটি এখন কার কাছে ?"

"তার দিদিমার কাছে। তার জন্যেই অত দিন আমার

ইউরোপে থাকা। নয়তো আমি স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আসতুম। তার কাছাকাছি থাকব বলে রোমে আমাদের দূতাবাসে চাকরি নিই। কথা ছিল আমাকে বরাবর রোমেই রাখা হবে, বদলি করলে বড় জোর বেলগ্রেডে কি বেয়ার্নে। কী যে হলো, দিল আমাকে টোকিওতে ঠেলে।"

এমনি অনেক কথা। একটা চাপা দুঃখ ছাইঢাকা আগুনের মতো ছিল। ছাই কেমন করে সরে গেল। নূপুর ভেবেছিল তার মতো দুঃখ কেউ কোথাও পায়নি। কিন্তু সুমন্তর দুঃখ কোনো অংশে কম নয়। বরং বেশী। সাথী মারা গেছে। দুঃখের কথা। কিন্তু সাথী ছেড়ে গিয়ে অপরের হয়েছে। এ যে আরো দুঃখের কথা। ছেলেমেয়ে হয়ইনি। দুঃখের কথা। কিন্তু মেয়েকে কাছে রাখার জো নেই, তার কাছাকাছি থাকাও হলো না। এ যে অসহনীয় দুঃখ। বেচারা সুমন্ত।

২

ওরা যখন চৌরাস্তায় আবার পা দিল তখন চ্যাটার্জি কোন্‌খান থেকে ছুটে এলেন। বললেন, "কোথায় না খুঁজেছি আপনাদের! আপনারা তো বেশ! প্রথম আলাপেই এত দূর। হোমচৌধুরী, সেলাম ভাই আপনাকে। অনেক ঘুঘু দেখেছি, বয়স কালে নিজেও ছিলুম। কিন্তু আপনার কাছে কেউ নয়।"

সুমন্ত চেয়ে দেখল নূপুর লজ্জায় ম্রিয়মাণ। ওসব কথা পুরুষে পুরুষে সাজে। মেয়েদের সামনে কেন? চ্যাটার্জিকে

চমকে দিয়ে বলল, "নূপুর যখন সেন ছিল তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। ও যদি আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ এক দিন গুপ্ত না হতো তা হলে আমিও হয়তো ইউরোপে চলে গিয়ে বনবাসী হতুম না। বলা যায় না, বরাতে থাকলে নূপুর ও আমি শ্রী ও শ্রীযুক্তা হোমচৌধুরী হলেও হতে পারতুম।

তখন চ্যাটার্জি তাঁর গৃহিণীকে বললেন, "শুনলে তো? আমি আগেই অনুমান করেছিলুম যে ওঁরা পূর্বপরিচিত।"

"ওটা তো আমারই অনুমান। তুমি আত্মসাৎ করে বলছ তোমার।" গৃহিণী হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। তার পর নূপুরের হাত ধরে বললেন, "এত দিন পরে তোর মুখে একটু হাসি-হাসি ভাব ফুটল। সত্যি, তোকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।"

চ্যাটার্জি প্রস্তাব করলেন, "চলুন, আমরা চার জনে মিলে মাউণ্ট এভারেস্টে যাই। ডিনার সেইখানে সারা যাবে। আমার নাম শুনলে ওরা তখনি টেবিল বুক করবে।"

তাঁর গৃহিণী বললেন, "কিন্তু তোমার যে আজ ক্লাবে কার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট।"

"ক্যানসেল করছি।" এই বলে চ্যাটার্জি টেলিফোন করতে ছুটলেন।

নূপুর বলল, "বসুধা, ভাই, মাফ করিস আমাকে। আমার হস্টেল বন্ধ হয়ে যাবে। আমি লেডী সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। আমি না থাকলে আমার মেয়েরা কী খাবে না খাবে কে দেখবে? সুমন্তকে ডিনারে নিয়ে যা। আমাকে বাদ দে।"

বসুধা ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু পীড়াপীড়ি করলেন না। স্কুলের কর্তাদের অনুমতি না নিয়ে নূপুর তো রাত করে হস্টেলে ফিরতে পারে না। সুমন্তকে বললেন, "ওর চাকরির এই এক দোষ। বাইরে বেশী ক্ষণ থাকলে জবাবদিহি করতে হয় ঠিক বালিকাদের মতোই।"

নূপুর চলে গেল। তখন সুমন্ত বলল, "আমি ওকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

এগিয়ে দিতে দিতে টাউন হল এলো, তার পর এলো ডাকঘর, তার পর রেলস্টেশন। কার্ট রোডের উপর দিয়ে কিছু দূর হাঁটতে হলো। তার পর ছাড়াছাড়ি।

ইতিমধ্যে নূপুর বলেছিল সুমন্তকে, "তুমি দেখছি বানিয়ে বলতে ওস্তাদ। কই, আমাকে তো কোনো দিন বলনি যে আমি গুপ্ত হয়েছিলুম বলেই তুমি বনবাসী হয়েছিলে। কিংবা গুপ্ত না হলে আমার হোমচৌধুরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।"

সুমন্ত বলেছিল, "তখন আমি সামান্য সাংবাদিক। আর গুপ্ত আমার দ্বিগুণ বয়সী ও দশগুণ যোগ্য অধ্যাপক। বি. এ. পাস করে তুমি তাঁর কাছে এম. এ. পড়ছ। তুমি তাঁর প্রিয় শিষ্যা হতে হতে গৃহিণী ও সচিব হলে। আমি কি তোমাকে বাধা দিতে পারি? বিয়ের পরে কি তোমাকে বলতে পারি যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম? যাক, ও-কথা ভেবে কী হবে? যা হবার তা হয়ে গেছে। ষোল বছর পরে ও-কথা যাকে বলে তামাদি হয়ে গেছে।"

নূপুর বলেছিল, "হাঁ। কিন্তু এতো দিন আমি ও-কথা

জানতুম না। আমার কাছে ওটা নতুন কথা। আজ যদি তুমি ও-কথা মুখ ফুটে না বলতে তা হলে এজন্মে জেনে যেতে পারতুম না যে আমার হোমচৌধুরী হওয়ার সম্ভবনা ছিল বা আমার জন্যে একটি ছেলে বনবাসী হলো। নামকরা কালো মেয়ে। কেউ ভালোবাসত না আমাকে। অন্তত আমার তা জানা ছিল না। জানলে কি আমি অত বড় ভুল জেনে শুনে করি! তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, সুমন। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, নিজেও কি পাইনি?"

সুমন তা শুনে আবেগভরে বলেছিল, "তুমি আমাকে এমন কী দুঃখ দিলে যে ক্ষমা করার কথা উঠবে। দুঃখ দিল আমাকে আরেক জন। আমার মাথা হেঁট হলো। আমি মুখ দেখাতে পারছিনে। মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্ছি। মা বাবা জানতে চাইলেন বৌ কেমন আছে। বলতে হলো, ভালো আছে। ভালো আছে সে কথা ঠিক। কিন্তু যে ভালো আছে সে আমার বৌ নয়। আমার বাবা মা তার শ্বশুর শাশুড়ী নন।"

তখন নূপুর বলেছিল বিচলিত হয়ে, "তা তুমি আবার বিয়ে করলে না কেন? ও দেশে কি মেয়ের দুর্ভিক্ষ?"

সুমন্ত বলেছিল, "ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। সুন্দর মুখ অনেক দেখেছি। ভালোবাসাও হয়েছে। কিন্তু জীবনে দ্বিতীয় বার প্রস্তাব করতে পারিনি যে, আমাকে বিয়ে করো। দু'দিন পরে আবার তো ইতিহাসের পুনরুক্তি হবে। কাজ কী বার বার উপহাস্য হয়ে? তার চেয়ে এই বেশ আছি।"

নূপুরকে এগিয়ে দিয়ে এসে সুমন্ত লক্ষ করল চ্যাটার্জি হাত পা ছুড়ে বিষম উত্তেজিত হয়ে কী যেন বকছেন আর তাঁর স্ত্রী তাঁকে শান্ত করছেন। সুমন্তর কানে এলো, “আমি দেখে নেব। চব্বিশ ঘণ্টা নোটিস না পেলে টেবিল বুক করবে না। আস্পর্ধা!”

সুমন্ত বুঝতে পারল। বলল, “ভালোই হলো। আমি আপনাদের সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে দু'টো কথা কইতে চাই। ওসব হোটেলে নিরিবিলি কোথায়!”

“যা বলেছেন।” বসুধা দেবী কৃতার্থ হয়ে বললেন, “এই চৌরাস্তাটাই এখনি উঠে যাবে ওসব হোটেলে। এই মুখ-গুলিকেই আরেক বার দেখবেন, নতুন কাউকে নয়। কী দরকার! তার চেয়ে এমন কোথাও যাওয়া যাক যেখানে প্রাণ খুলে তিন জনায় কথাবার্তা হবে।”

চ্যাটার্জি তখনো গজগজ করছিলেন। সুমন্ত বলল, “আপনারা আমার অতিথি। আসুন, চীন দেশে যাওয়া যাক। চীনা খাবার খাওয়া যাক।”

কাছেই একটা চীনা রেস্টোরান্ট ছিল, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এলো সুমন্ত। অনিচ্ছুক চ্যাটার্জিকে ধরে নিয়ে চলল সেখানে, তাঁর সদয় সহধর্মিণীর সৌজন্যে।

“কী অধঃপতন! কী অধঃপতন! যেই দেখবে সেই বলবে চ্যাটার্জি সাহেব এত নিচে নেমেছেন যে চীনারাই তাঁর অগতির গতি!” চ্যাটার্জির চেহারা অতি করুণ।

কিন্তু চীনারা যা আপ্যায়ন করল তা রাজোচিত। বিশেষ

একটি দ্রব্য তাঁর কাছে প্রীতিকর ছিল। সে শুধু যোগাতে পারে চীনারাই। দেখতে দেখতে তিনি মেতে উঠলেন। 'আপনি' থেকে নামলেন 'তুমি'তে।

সুমন্ত জানতে চেয়েছিল নূপুরের ইতিহাস। চ্যাটার্জি আর তাঁর গৃহিণী যিনি যেটুকু জানতেন তিনি সেটুকু জানালেন। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বের করে নিল সুমন্ত। এক-সঙ্গে সবটা নয়, অলক্ষিতে একটু একটু করে। আগেকার ঘটনা আগে নয়, পরেরটা আগে, আগেরটা পরে। মনে মনে সম্পাদনা করলে বিবরণটা দাঁড়ায় এই রকম।

অধ্যাপকরা সাধারণত অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন। তা বলে অপ্রকাশ গুপ্তর মতো কেউ নন। পঞ্চাশোর্ধ্বে যখন বনে যেতে হয় তখন তাঁর মনে পড়ল যে বাণপ্রস্থের পূর্ব আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য, সেটি তখনো বাকী। অমন একটা মারাত্মক ভুল ঘটে গেল, তিনি টের পেলেন না। আশ্চর্য! না? তা হলে বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা রইল কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বর্ণাশ্রমীদের রাজত্ব। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়। 'অন প্রিন্সিপ্ল' তাঁর বিবাহ করা উচিত।

অধ্যাপক তাঁর সে ভুল শুধরে নিলেন ছাত্রী নূপুরকে উপাধ্যায়ানী পদে উন্নীত করে। বয়সে ত্রিশ বছরের ছোট বড়। দু'জনের দুই জেনারেশন। মনের দিক থেকে অনতিক্রম্য ব্যবধান। দেহের দিক থেকে একজনের উঠতি, অপর জনের পড়তি। চড়াই উতরাই। বিয়ের পর এক মাস যেতে না যেতে গুপ্ত উপলব্ধি করলেন যে এক ভুল শোধরাতে

গিয়ে তিনি আরেক ভুল করে বসে আছেন। এ ভুল এমন ভুল যে এর সংশোধন না হলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়বে। হয়তো যক্ষ্মা বা সেই রকম কিছু হবে। কোথায় বাণপ্রস্থ আর কোথায় টি. বি. স্যানাটোরিয়াম! তখন তো স্ত্রীর কপালে অকাল বৈধব্য, তার আগে 'বাধ্যতামূলক' ব্রহ্মচর্য। তার চেয়ে ভালো, গুরুর কাছে গিয়ে মন্ত্র নেওয়া। স্বামীস্ত্রী দু'জনেই শপথ করা।

কোনো রকম পরামর্শ না করেই নূপুরকে তিনি সোজা নিয়ে গেলেন গুরুজীর আশ্রমে। নিজে মন্ত্র নিলেন, স্ত্রীকেও নেওয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে শপথ করা হয়ে গেল দু'জনের যে, যত দিন প্রাণ তত দিন ব্রহ্মচর্য।

নূপুর কল্পনাই করেনি যে তাকে মন্ত্র নিতে হবে, শপথ করতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহ করার সাহস তার ছিল না। তা ছাড়া সে ধন্য হয়েছিল অমন শিবের মতো স্বামী পেয়ে। কালো মেয়ে, কেউ বিয়ে করতে চায় না। বাপকে না জানি কত পণ দিতে হতো ও-মেয়েকে পার করতে। আর নয়তো সারা জীবন মাস্টারি করতে হতো বিয়ের আশা ছেড়ে। তার দেশমান্য স্বামীর কাছে সে পরম কৃতজ্ঞ। বিদ্রোহ করবে কী? মেনে নেবে। কপালে সুখ না থাকলে কেউ কখনো সুখী হয়? কপাল, কপাল, সবটাই কপাল। অপ্রকাশ গুপ্তর মতো পতি পাওয়াও কপাল, তাঁর জীবদ্দশায় ব্রহ্মচারিণী হওয়াও কপাল।

কিন্তু মন যে মানে না। বি. এ. পাস করা একেলে মেয়ের

মন। আর মন যদি বা মানে প্রকৃতি মানে না। একটা কিছু ছল পেলেই স্বামীর শোবার ঘরে যায়, পায়ের তলায় বসে, হাত বুলিয়ে দেয়। গুপ্ত খেঁকিয়ে ওঠেন। "থাক, থাক, গায়ে হাত দিতে হবে না। ডাইনী কোথাকার!" কোনো কোনো দিন বলেন, "দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে।" এমনি কত রকম সন্ত বচন। নূপুরের ইচ্ছা করে গলায় দড়ি দিতে। কিন্তু সাহসে কুলায় না। বাপের বাড়ী চলে যেতে চায়। কর্তা যেতে দেবেন না। তাঁকে দেখাশুনা করবে কে!

সব চেয়ে অবিশ্বাস্য কথা ভদ্রলোকের ক্ষমতা না থাকলেও আকাঙ্ক্ষা ছিল। চুরি করে তিনি বাৎস্যায়ন পড়তেন। পড়াই সার। পরীক্ষা নিরীক্ষা অসার। নূপুর যেদিন আবিষ্কার করল যে বাৎস্যায়নের পুঁথি প্রাচীন ভারতের পদার্থবিজ্ঞান নয় সেদিন তার মোহভঙ্গ হলো। কিন্তু হলেই বা কী করতে পারে সে! তার হাত পা বাঁধা। তবে তার মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব এলো। গুপ্ত সেটা লক্ষ করলেন। তখন তিনি এক অভিনব চাল চাললেন।

তাঁর বাড়ীখানা লিখে দিলেন নূপুরের নামে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিলেন—ভাড়া দিতে পারবে না, বন্ধক রাখতে পারবে না, য়্যাসাইন করতে পারবে না, দান করতে পারবে না, বিক্রী করতে পারবে না, উইল করতে পারবে না। যত দিন আয়ু তত দিন ঐ বাড়ীতেই বসবাস করতে হবে। তার পরে ও বাড়ী গুরুজীর আশ্রমের।

সম্পত্তি যা ছিল তা তিনি ট্রাস্টীদের হাতে তুলে দিলেন। তার থেকে মাসোহারা পাবে নূপুর। সে মাসোহারা কলকাতার পক্ষে যথেষ্ট। দার্জিলিং বা অন্য কোথাও যদি যায় তবে বাড়ীভাড়া দিয়ে বিশেষ কিছু বাঁচবে না, সুতরাং যাওয়া হবে না। যখের মতো আগলাতে হবে কলকাতার সেই বাড়ী। তার এক অংশে মেয়েদের জন্যে একটা ইনস্টিটিউট থাকবে। সেখানে এসে তারা শিখবে ভারতনারীর চারিত্র্য এবং ঐতিহ্য। শেখাবেন নূপুরের মতো আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মচারিণীগণ!

আপৎকালে কিছু থোক টাকার দরকার হতে পারে। তার জন্যে ট্রাস্টীদের অধিকার দেওয়া হলো। নূপুরের অসুখ বিসুখ হলে খরচপত্র যা হবে তা ট্রাস্টীরাই বহন করবেন। তা হলে একটি প্রাণীর আর কী ন্যায়সঙ্গত দাবী থাকতে পারে? কেনই বা সে আবার বিয়ে করতে চাইবে? চাইলেই বা তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে কেন? গুপ্ত নিজে যখন ব্রহ্মচারী নূপুর কেন তা হবে না? কেন হতে পারবে না? ছেলেদের জন্যে তিনি যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন তার ভূমিকায় শেষ লাইনটি এই। “একজন যা পারে আরেক জন তা পারে।” এটি তাঁর বাণী।

অধ্যাপকের কোনো অধ্যাপক ছিলেন না। তাই তাঁকে কেউ বলতে ভরসা পাননি যে বৃদ্ধকে যা জীবনীশক্তি জোগায় তরুণী ভার্যাকে তা জীবন থেকে বঞ্চিত করে। তাঁর নিজের পক্ষে যা বাঁচবার শর্ত নূপুরের পক্ষে তা বন্ধ্যা হবার শর্ত। না বাঁচবার শর্ত।

দশটি বছর তার হাড় মাস জ্বালিয়ে গুপ্ত এক দিন সুপ্ত হলেন চিরনিদ্রায়। তিনি মনে করেছিলেন নব্বুই বছর বাঁচবেন, সেইজন্যে নিয়মগুলো তাঁর দিন দিন কঠোর হচ্ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে দীর্ঘ পরমায়ুর তেমন কোনো সম্বন্ধ তাঁকে দিয়ে প্রমাণিত হলো না। নূপুরও মনে মনে বিশ্বাস করত যে ব্রহ্মচর্যের জয় হবেই। স্বামী নব্বুই কেন, একশো বছর বাঁচবেন। তাকে বিধবা হতে হবে না। সে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে এয়োরানী এয়োতি নিয়ে স্বর্গে যাবে। তার বিড়ম্বিত জীবনের এই হবে চরম সান্ত্বনা।

কিন্তু সেই তো গেল লোকটা ষাট বছর বয়সে, যে-বয়সে অন্যান্য অধ্যাপকদের পুত্রকন্যা হচ্ছে, পাকা চুল কাঁচছে, য়্যাভিডেভিট করে বয়সও কমছে। তবে কেন নূপুরকে মেরে রেখে গেল! কী তার লাভ হলো অন্য একটি প্রাণীকে জীয়ন্ত ব্যবচ্ছেদ করে! বিদ্রোহের ভাব প্রবল হলো এবার। কিন্তু নিরুপায়। দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে চাইলে বাড়ীটি হারাবে, মাসোহারাটি বন্ধ হবে, থোক টাকা জুটবে না অসুখে বিসুখে। তার চেয়ে বড় কথা, শপথ ভঙ্গ হবে। বজ্র আঁটুনি। অপ্রকাশ গুপ্ত তাঁর মৃত হস্ত দিয়ে বজ্র মুষ্টিতে ধরে আছেন নূপুর গুপ্তর হাত। যেমন ধরেছিলেন বিবাহবাসরে।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। কয়েক বছর পরে গবর্ণমেণ্ট ও-বাড়ী রেকুইজিশন করে। ভাড়া যা দেয় তা নিয়ে ট্রাস্টীদের সঙ্গে নূপুরের বিবাদ বাধে। নূপুর বলে, “আমাকে ও-টাকা দেওয়া হোক, আমি দার্জিলিং বা শিলং গিয়ে মনের মতো বাড়ী

ভাড়া করে থাকি।" ওঁরা বলেন, "আপনার মনের মতো হলে তো হবে না। কর্তার মনের মতো হওয়া চাই। তিনি যে চেয়েছিলেন ভারতনারীর চারিত্র্য এবং ঐতিহ্য, আপনার মধ্যে ও আপনার মারফৎ একালের মেয়েদের মধ্যে। ইনস্টি-টিউট হবে বাড়ীর এক অংশে। দার্জিলিং বা শিলং তার পক্ষে অনুকূল নয়।"

এ ঝগড়া মিটল না। নূপুর রাগ করে দার্জিলিং চলে এলো। এখানে চাকরি নিল। বাড়ীভাড়ার টাকা তো হারালোই, মাসোহারা মনি অর্ডার করে পাঠালে মনি অর্ডার ফেরৎ দিল। অসুখ বিসুখ হয়নি, হলে কী করত বলা যায় না। আপোসের চেষ্টা একাধিক বার হয়েছে। চ্যাটার্জি স্বয়ং করেছেন। নূপুর বলে, "স্বামীর ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে আমি তাঁর স্ত্রী আমি যা বলব তাই হবে। বাইরের লোক ট্রাস্টী হয়েছে বলে তাদের ইচ্ছায় আমি চলব! পতিব্রতা মানে কি ট্রাস্টীব্রতা!"

নূপুর কিন্তু বিয়ে করতে নারাজ। শপথভঙ্গ করলে পাপ হবে।

৩

পরের দিন রবিবার। সকালে উঠে সুমন্ত চৌরাস্তায় গিয়ে জুটল। ভিড় নেই। ভিড় জমতে জমতে দশটা বাজে। তার আগেই সে নূপুরের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিতে চায়। নূপুর বলেছিল সাড়ে আটটা নাগাদ আসবে। এলো ঠিক। দু'জনে

মিলে বেড়াতে গেল ম্যাল হয়ে বার্চ হিল। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে দৃষ্টি রেখে।

সুমন্ত বলল, "কাল চাটুজ্যেদের কাছে সমস্ত শুনেছি।"

নূপুর চমকে উঠে বলল, "তাই নাকি! কী শুনেছ ?"

সুমন্ত খুলে বলল যা শুনেছিল। তার পর বলল, "আমি আশা করিনি যে তোমাকে মুক্ত দেখব। দেখে আশান্বিত হয়েছিলুম। কিন্তু পরে যা শুনলুম তা আমাকে হতাশ করেছে। নূপুর, তোমাকে আমি বাধ্য করব না। তার চেয়ে নিজে সরে যাব। আজ বিকেলের প্লেনে আমি কলকাতা চললুম। পরশু টোকিও যাত্রা।"

নূপুর বলল বিমর্ষ হয়ে, "সত্য যখন করেছি তখন সত্যরক্ষা করতেই হবে। সত্যের দায় অস্বীকার করলে মহাপাতক হবে। তুমি আমি কেউ সুখী হব না, কারো কল্যাণ হবে না। আর যারা আসবে তাদের ঘোর অমঙ্গল হবে।"

এর উপর কথা চলে না। সুমন্ত বলল, "বেশ, তা হলে আমি যাই। আবার কবে দেখা হবে তা সম্পূর্ণ তোমার হাতে। যেদিন আসতে লিখবে সেদিন আসব ছুটি নিয়ে। এসে তোমায় নিয়ে যাব। আমি ভুল বুঝেছিলুম। মুক্ত তুমি আইনের দিক থেকে। হৃদয়ের দিক থেকে। কিন্তু সংস্কারের দিক থেকে নও। সত্য যাকে তুমি বলছ তা একটি বৃদ্ধকে তাঁর তরুণী ভার্যার প্রাণঘাতী আকর্ষণ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কল্পিত। দশ বছর ধরে সেই কল্পিত সত্য তাঁকে বাঁচিয়েছে। এখন তিনি মৃত। মৃতকে বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে

না। বরং আপনাকে বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে। আত্মরক্ষা কি একটা অপরাধ? আত্মার সঙ্গে সত্যরক্ষা কি একটা অন্যায়? তোমার অন্তরাত্মা কী বলে?”

সুমন্ত সেই দিন বিদায় নিয়ে চলে গেল। নূপুর তাকে আশা দিতে পারল না।

চাটুজ্যেরা জানতেন না যে হোমচৌধুরী বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, নূপুর রাজী হয়নি। তাঁরা আর সে প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন না। তখনকার মতো যবনিকা পড়ল।

কয়েক মাস পরে বসুধা দেবী খবর পেলেন যে নূপুরের শরীর ভালো নেই। দেখা করতে গেলেন। কী হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর পেলেন মামুলি। ডাক্তারী শাস্ত্রে যা বলে। ট্রাস্টীদের কাছে থোক টাকার জন্যে চিঠি লেখার কথা তোলায় নূপুর চঞ্চল হয়ে উঠল। না, না, তা কিছুতেই নয়।

“তবে কি তুই বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবি?” তিনি মুখ ফুটে বললেন না যে, মারা যাবি। কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

“এ যাত্রা আমার বাঁচোয়া নেই, সুধা। এ রোগ চিকিৎসার অসাধ্য।”

“কেন? কেন? এমন রোগ ক'টা আছে যা চিকিৎসায় সারে না, থামে না? এখন থেকেই হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো কী হয়েছে?”

“আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নেই, ভাই। কে আমাকে বাঁচাবে?”

বসুধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "ছি! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই। তোকে বাঁচতেই হবে!"

সেদিন দুই সখীতে অনেক কথা হলো। মনের কথা। গোপন কথা। বোঝা গেল নূপুর প্রেমে পড়েছে। সুমন্তকে বিয়ে করতে পেলে বাঁচে। কিন্তু তার ভিতরের বাধা অলঙ্ঘ্য সত্যরক্ষার দায়। শপথভঙ্গের ভয়। কে জানে কী অকল্যাণ হবে!

বসুধা বললেন, "তাই যদি হতো, কিছু কোথাও নেই, অকস্মাৎ রোম থেকে টোকিওতে বদলি হতো না সুমন্ত, এক দিনের জন্যে দার্জিলিং আসত না, দেখত না তোকে, শুনত না তোর ইতিহাস। এসব প্রজাপতির চক্রান্ত। ভগবানের ইচ্ছা। ওদিকে তারও তো বৌ থাকতে বৌ নেই। বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সে বৌ এখন পরকে বিয়ে করে পরস্ত্রী। বেচারা সুমন্ত! তুই যদি তার ভার না নিস্ আর কেউ না কেউ নেবে। তখন কি তোর ভালো লাগবে!"

মনের দুঃখ মনে চাপা ছিল বলে নূপুর এত কষ্ট পাচ্ছিল। সখীর কাছে অনাবৃত হওয়ায় হালকা বোধ করল। কিন্তু দোটানা তার কিছুতেই গেল না। এক দিকের টানে তার মুখে রং ধরল। নবারুণ রাগ। প্রেমে পড়লে, প্রেম পেলে যা হয়। অন্য দিকের টানে স্নায়বিক বিকার, মানসিক অবসাদ। যত রকম দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা। হাড়ে হাড়ে ভয়। কে জানে কী অকল্যাণ হবে, কী দুর্ঘটনা ঘটবে! তরুণী বধূর মতো রাঙা টুকটুকে

তার চেহারা। কিন্তু শরীরের কল বিকল হয়ে এলো। কে কবে এমন দোটানায় পড়েছে!

বসুধা দেবী কী আর করবেন? তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। দেখা হলেই তিনি তাকে বোঝাতেন, "সময় আর জোয়ার কারো তরে সবুর করে না। বয়স একবার গড়িয়ে গেলে তখন হাজার মাথা খুঁড়লেও মা হওয়া যায় না। নারীকে প্রকৃতি যে মহাসুযোগ দিয়েছে নারী যদি তা বয়ে যেতে দেয় তবে তার জীবন বৃথা। নূপুর, আর সাত আট বছর পরে তোকে অনুশোচনা করতে হবে।"

নূপুর বোঝে, কিন্তু তার প্রশ্ন হলো, "শপথ ভঙ্গ করলেও তো অনুশোচনা। কোনটা বেশী, কোনটা কম? এর উত্তর কে আমাকে দেয়?"

"এর উত্তর কেউ কাউকে দিতে পারে না। তোকেই দিতে হবে এক দিন। তত দিনে হয়তো বড় দেরি হয়ে গেছে। সুমন্ত হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে বসেছে। আর কারো প্রেমে পড়েছে।" বসুধা দেবীর এই হলো শেষ তাস।

আরো কথা ছিল। নূপুর ভেঙে বলত না। বাড়ীটা এক দিন না এক দিন খালি পাওয়া যাবে। গবর্নমেণ্ট ছেড়ে দেবে। সে রকম কথাবার্তা চলছে। ট্রাস্টীরাই চালাছেন। মাসোহারা মাসের পর মাস জমছে তাঁদের হাতে। একসঙ্গে পাওয়া যাবে হাজার দশেক টাকা। তা ছাড়া আপদে বিপদে ঐ যে থোক টাকার টোপ ঝুলছে ওটিও মাছকে লোভ দেখায়, ও লোভ এমন লোভ যে থোক টাকার ভরসায় লোকে

আপদে বিপদে পড়ে। অসুখ বিসুখেরও একপ্রকার চুম্বকশক্তি আছে। নূপুর তলে তলে গুপ্ত জালে জড়িয়ে পড়েছে। গুপ্ত মহাশয়ের জালে। সে জাল কাটাতে পারা তার সাধ্যের বাইরে। ততখানি মনের জোর তার নেই।

তার প্রয়োজন ছিল একটি ইচ্ছার ক্রিয়া। যে-ক্রিয়া একান্ত কঠিন। সে যদি তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে একটি বার বলতে পারত, "চাইনে আমার ধনসম্পদ," যদি বলতে পারত, "যাতে আমাকে অমৃত না করবে কী হবে তা নিয়ে," তা হলে সব সমস্যা জল হয়ে যেত। স্বাস্থ্য ফিরত। আয়ু বাড়ত। জীবনের স্বাদ মিলত। যখের মতো পরের ধন আগলাতে গিয়ে জীবন নষ্ট হতো না। বোঝে এ কথা নূপুর। বোঝে বলেই তো আরো ভোগে। তার ইচ্ছাশক্তি পক্ষাঘাতে অসাড়। সে অসহায়ের মতো চেয়ে আছে নিজের দিকে। হায়! কেউ কেন তাকে বাঁচায় না!

সুমন্তকেই আসতে হলো আবার উড়ে। এক মাসের ছুটি নিয়ে। দার্জিলিংয়েই বাসা নিতে হলো। এবার সে মনঃস্থির করে এসেছিল যে নূপুরকে ওর ভাগ্যের হাতে একা ছেড়ে দিয়ে যাবে না। দরকার হলে নিজেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওর কাছাকাছি থাকবে, আর কিছু করবে। জাপানের একটা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল। সব দেশে ওদের সংবাদপ্রেরক আছে। প্রকৃত পক্ষে ওটা আন্তর্জাতিক। ওটা কারো মুনাফার জন্যে নয়।

এই এক বছরে সুমন্তর যা পরিবর্তন হয়েছিল তা দৃঢ়তার

দ্যোতক। তার প্রায় চল্লিশ বছরের জীবনে সে দু' দু' বার দাগা পেয়েছিল। এক বার তো নূপুরের বিয়েতে। দ্বিতীয় বার তার পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদে। এর ফলে তার বিশ্বাস ভেঙে গেছল। নারীর উপর বিশ্বাস। নিজের উপর বিশ্বাস। সে নিজে মানুষের মতো মানুষ হলে, পুরুষের মতো পুরুষ হলে, এমন অপদস্থ বার বার হতো না। কিন্তু কোথায় তার নিজের দোষ তা সে বহু দিন আত্মপরীক্ষা করেও পায়নি। বরাতকেই দোষী করেছে। শিভ্যালরি বশত নারীকে দোষ দেয়নি। অথচ নারীর প্রতি আস্থা ফিরে পায়নি। আকস্মিক ভাবে নূপুরকে পুনরাবিষ্কার করে তার ভাবান্তর ঘটে। জাপানে গিয়ে পুরো এক বছর কাল ভাবে। ভাবতে ভাবতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে জীবনটাকে ভাঙতে দেওয়া হবে না, গড়তে হবে আবার। নারীর হাত না লাগলে গড়ে উঠবে না জীবন। নতুন কোনো নারী নয়, ওই পুরাতন নূপুর।

সুমন্ত লক্ষ করল যে নূপুর ঠিক নারাজী নয়, নিমরাজী। এক বছরে এত দূর অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হবে না, যদি না ওর যখের ধনের মায়া কাটে। মায়া যদি একটা রজ্জু হতো তা হলে খড়্গ দিয়ে তাকে ছিন্ন করা যেত। কিন্তু এ হলো অদৃশ্য বন্ধন। এর প্রতি লেশমাত্র মমতা থাকতে মুক্তি নেই। এ বন্ধন তো আছেই, এর উপর রয়েছে শপথভঙ্গের বিভীষিকা। কী জানি কী অমঙ্গল হবে! ইহকালে ও পরকালে। এ বিভীষিকা থাকতে শান্তি নেই। বিবাহ করেও কি সুখ আছে!

তা হলেও সে হাল ছেড়ে দেবে না। নূপুরের দুরবস্থা তাতে বাড়বে। বজ্র আঁটুনি ওকে বাঁচতে দিচ্ছে না। সম্পত্তির মোহ মানুষকে ক'দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে! আর ঐ যে শপথভঙ্গ ঘটিত অন্তর্বিরোধ—প্রাণ চায়, সংস্কার না চায়—ও যে ওকে তিলে তিলে মারছে। বিবেকের ছদ্মবেশ পরে এসেছে স্থূলভ একটা সংস্কার। সেটাকে মারাত্মক করেছে ভারতনারীর চারিত্র্য এবং ঐতিহ্য বলে কথিত স্বামীকুলের সুবিধাবাদ। ঐহিক ও পারত্রিক স্বার্থ। বিড়ম্বিতা নারী বিড়ম্বনাকেই নোঙর মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তলিয়ে যেতে যেতে। সুমন্ত তা হতে দেবে না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ করবে।

প্রতি দিন তাদের দু'জনের দেখা হয়। একসঙ্গে বেড়ায় দু'জনে। কথাবার্তা ফুরয় না। চাটুজ্যেরা জানেন ও বোঝেন ওটা কথাবার্তা নয়, সংগ্রাম। হাসি তামাশা করেন না। দূরে দূরে থাকেন। নূপুরের সহযোগিনীরাও। মত আছে তাঁদের সকলেরই। কেউ এ বিয়েতে অন্যায় কিছু দেখেন না। কিন্তু মনঃস্থির করতে হবে নূপুরকেই।

"আমি যে কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছিনে, সুমন।"

"তা হলে আরো সময় নাও। আমি জাপান ফিরে যাই।"

"না। না। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

"আমিও কি পারব! তবু ছেড়ে থাকতেই হবে। নইলে কোনো দিন তুমি মনঃস্থির করতে পারবে না। কেবলি গড়িমসি করবে।"

"না। না। তুমি যেয়ো না। যেয়ো না আমাকে ছেড়ে।"

"তবে চলো আমার সঙ্গে।"

"না। না। আমার যে ভয় করে।"

৪

অবশেষে সত্যি সত্যি ওদের বিয়ে হয়ে গেল। সিভিল ম্যারেজ। চাটুজ্যেরা একটা রিসেপশন দিলেন বাছা বাছা কয়েকজন বন্ধু বন্ধুনীকে। তাঁরাই যেন বরকর্তা ও কন্যাকর্ত্রী। অনেক দিনের চাপা রসিকতা এক দিনে ফেটে পড়ল। নূপুরের সিঁথিতে সিঁদূর দেওয়া হলো। তা দেখে চ্যাটার্জি বললেন, "কিন্তু আমি ভাবছি ওর গালে সিঁদূর দিল কে? সুমন্ত নয় তো?"

বিয়ের রাত্রে সুমন্ত আশা করেছিল নূপুর সুখী হবে, সুখী করবে। কিন্তু শয্যায় গিয়ে দেখল নূপর কাঁদছে। সে কী কান্না! আকুলি ব্যাকুলি হয়ে অঝোর চোখে কান্না। ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। যেন বুক ফেটে গেছে বা যাচ্ছে।

দেখেশুনে সুমন্তর কান্না পায়। সেও চোখের জল ফেলে। এমনি করে কে জানে ক' ঘণ্টা কাটে। কান্নার ম্যারাথন রেস আর কী! বিলকুল নন্-স্টপ। যেমন দার্জিলিংয়ের বৃষ্টি। এ কি তিন দিনের আগে থামবে!

সুমন্ত বলল, "জানি তোমার অনুশোচনা হচ্ছে যখের ধন গেছে, কিন্তু শপথভঙ্গ এখনো তো ঘটেনি। অত আকুল হয়ে

কাঁদছ কেন ? আমি এখনি খাট থেকে নেমে যাচ্ছি। কালকেই জাপানের পথে রওনা হব। তুমি চাও তো এ বিয়ে ভেঙে দিতে পারো। দোষ আমাকেই দিয়ো। অপবাদ মাথায় নিতে নিতে আমার মাথায় কড়া পড়ে গেছে। গণ্ডারের চামড়া। লাথি খেতে খেতে আমি ঘাগী হয়ে গেছি। তোমার মান যাতে থাকে তাই করো। বুঝিয়ে বললে ট্রাস্টিরা যখের ধন ফিরিয়ে দেবে।"

সুমন্ত নেমে যাচ্ছিল, নূপুর তার হাত ধরে বলল, "ওগো, যেয়ো না। তুমি যেয়ো না। তুমি গেলে আমি বাঁচব না। মরে যাব।"

তার কাঁদন হঠাৎ থেমে গেল। তার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়তে থাকল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ। কিন্তু অন্ধকারে চোখে পড়ল না সুমন্তর। কী যেন সে বলতে চায়। সঙ্কোচে বলতে পারছে না। চুপ করে রয়েছে।

সুমন্ত বলল, "নূপুর, আমি তোমার জীবন থেকে এক বার সরে গেছলুম। আবার সরে যাব। ভেবে দেখছি তোমার জীবনে আমার ঠাঁই নেই। আমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। আমাকে উড়ে যেতে দাও। কেঁদো না, লক্ষ্মীটি।"

নূপুর বলল, "আমি কি কাঁদছি ? আমি তো কাঁদছিনে।"

"এই তো এত ক্ষণ ধরে কাঁদছিলে। রাত বোধ হয় তিনটে বাজল। ঘুমোবে না ? ঘুমোতে দেবে না ?" সুমন্ত হাই তুলতে তুলতে বলল।

নূপুর সুমন্তর বুকে মুখ গুঁজে বলল, "না।"

"এ তো ভ্যালা বিপদ। কী যে করি তোমায় নিয়ে। কী যে তুমি চাও। কী যে তোমার মনের সাধ! দয়া করে বলবে কি একটি বার!"

নূপুর বলল না। তবে বুঝতে দিল যে মেঘের কোলে রোদ হেসেছে।

সুমন্ত তাকে একটু আদর করে বলল, "আমি জানি তুমি শপথভঙ্গ করবে না। আমিও তোমাকে বাধ্য করব না। এসো, তা হলে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আমরা একসঙ্গে থাকি। বন্ধুর মতো, বন্ধুনীর মতো। আমরা পরস্পরের সাথী।"

নূপুর সহসা বলে উঠল, "ওগো, তা নয়। ওগো, তা নয়।"

সুমন্ত উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, "তবে কী? তবে কী? তবে কেন অত কাঁদছিলে?"

নূপুর তাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আধো আধো স্বরে বললে, "ওগো, তুমিও কি যোগী হবে?"

পুলকে ও বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে ক্ষণকাল নির্বাক থাকল সুমন্ত। আবিষ্কারকের মতো উল্লাস ভরে বলল, "ওঃ এইজন্যে এত কান্না! যোগী! আমি হব যোগী!"

আবার কী মনে করে প্রিয়াকে আতঙ্কিত করে তুলল এই বলে, "হাঁ হাঁ, যোগী হব আমি। যেমন তেমন যোগী নয়, মহাযোগী।"

তারপর নিজেই আতঙ্কিতার আতঙ্ক ভঞ্জন করে বলল, "কার মতো, জানো? কুমারসম্ভবের মহাদেবের মতো।"

ঠিকানা

সেদিন কাগজে বেরিয়েছে একখানা পোস্টকার্ড নাকি ঠিকানা বদল করতে করতে চব্বিশ বছর পরে ঠিকানাদারের হাতে পৌঁছেছে।

এ ধরনের খবর এই প্রথম নয়। এমনি একটা খবর পড়ে অনেক দিন আগে সরিৎপতি বর্ধন বলেছিলেন তাঁর কাছে শিক্ষানবীশ সহকারী শাসক অতনু মল্লিককে, "অবিকল আমার জীবন আর কী।"

"আপনার জীবন!" বিস্মিত হয়েছিল অতনু।

"এক ঠিকানা থেকে আরেক ঠিকানায় রিডাইরেক্‌টেড হতে হতে চলেছি। কবে যে শেষ ঠিকানায় পৌঁছব সেই আশায় দিন গুনছি। কেটে গেল পঁচিশ বছর।" তাঁর কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। কড়া মেজাজের হাকিম বলে যারা তাঁকে জানে তারা তাঁকে কতটুকুই বা জানে।

অতনু ভেবেছিল শেষ ঠিকানা মানে মৃত্যু। কিন্তু তা হলে "আশা" কেন? বলতে হয় "আশঙ্কা" বা তেমনি কিছু।

খুলে বললেন বর্ধন, "আর বছর পাঁচেক পরে পেনসন। আরো আগে নিতে পারলে আরো ভালো। কিন্তু ওরা যখন আমাকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট করেছে তখন কে জানে-হয়তো একবার বুড়ী ছোঁয়ানোর মতো ডিভিজনাল কমি-

শনারও করবে। এ মোহ আমার এখনো গেল না। আই কনফেস।”

দ্বিগুণ বয়সীর অন্তরঙ্গ হওয়া বহু ভাগ্যের কথা। অতনু বলল সলজ্জ ভাবে, “মোহ কেন বলছেন? ও তো আপনার পাওনা।”

“ইয়ং ম্যান!” ডাক বাংলার বারান্দায় আরাম কেদারায় অর্ধশয়ান হয়ে বর্ধন বলতে লাগলেন গড়গড়া টানতে টানতে, “সেই যে আছে গাধার সামনে গাজর ঝুলিয়ে রেখে সমস্তক্ষণ সে বেচারিকে দৌড় করানোর কথা, সরকারী চাকরিতে প্রমোশন হচ্ছে সেই গাজর। পঁচিশ বছর দৌড়নোর পর এই প্রথমা মিলল প্রমোশন। কই, এমন কী সুস্বাদু! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে আরম্ভ করে দিয়েছি এর চেয়ে বড় মাপের গাজরের জন্যে। আপনার জীবনেও দৌড়নো শুরু হয়েছে। আপনারা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান। অতকাল অপেক্ষা করতে হয় না। কিন্তু হরে দরে একই কথা। পাওনা নয়, মোহ।”

অতনু নতুন এসেছে। কীই বা জানে! দ্বিগুণ বয়সীর সঙ্গে তর্ক করে না। পাশের আরাম কেদারাটায় গা মেলে দিয়ে অস্বচ্ছন্দ বোধ করে, মাঝে মাঝে উঠে বসে, কিন্তু মন দিয়ে শোনে। ডাক বাংলায় দু’জনের নাইট হল্ট। খানা-পিনা একসঙ্গে।

“লুক য়্যাট চারুসদয় ডাট। কী অপমান! কমিশনার থেকে ম্যাজিস্ট্রেট। তাও কপালে সইল না। ময়মনসিং থেকে বীরভূম। আমি হলে সেই দিনই পেনসন নিতুম।”

অতনু দুঃখিত হয়ে রয়েছিল। দুঃখ জানিয়ে বলল, "তাঁর অপরাধ তিনি দেশভক্ত।"

তারপর বর্ধন একটু একটু একটু করে ভেঙে বললেন তাঁর জীবনের কাহিনী ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। কত রকম শখ ছিল তাঁর প্রথম বয়সে। এক এক করে সব মুলতুবি রাখতে হলো চাকরির জ্বালায়, বদলির ঝঞ্ঝাটে! কোথাও একজায়গায় স্থির হয়ে না বসতে পারলে নিজের মনের মতো করে বাঁচা যায় না। স্থির হয়ে বসাটাই আদত কথা। এক ঠিকানায়।

ইতিমধ্যে এক দাগ জমি কিনেছেন তিনি ব্যারাকপুরের কাছে। একসঙ্গে পাঁচবিঘা। ছোটখাটো একটা বাংলো বানিয়েছেন। পরে বাড়ালে চলবে। এই পর্যন্ত বাইরে থেকেও করা যায়। বাকীটার জন্যে চাই ঘটনাস্থলে থাকা। ফুলের চাষ করবেন, সে ফুল চালান যাবে কলকাতায়, সেখানে বিক্রী হবে। যদিও এটা তাঁর শখ তবু শখটাকে নিজের খরচ নিজে ওঠাতে হবে। এর জন্যে তিনি রাশি রাশি উদ্যান বিদ্যার বই পড়েছেন। ফুলের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি পালন করা দরকার। মৌমাছি পালন বিদ্যাও তিনি পুঁথি পড়ে আয়ত্ত করেছেন। মধু বিক্রয় করে তিনি মধুমক্ষিকার পালনব্যয় উদ্ধার করবেন।

এ ছাড়া তাঁর থাকবে একটা ল্যাবরেটরি। সেখানে বসে তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেন। মাটি আর জল আর উদ্‌ভিদ্ আর সার এর কোনোটাই তাঁর বিশ্লেষণের অতীত নয়। এ দেশে কৃষি কেন সফল হয় না তার মূল কারণ এই পরীক্ষণের অভাব। ল্যাবরেটরির খরচ কী করে ওঠানো

যায় তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। এই জন্যেই তো পেনসন এত দরকারী। তাঁর আবার গ্রহনক্ষত্র নিরীক্ষণের বাতিক আছে। তার জন্যে চাই দামী দূরবীণ। দূরবীণ নিয়ে রাত জাগবেন। দিনের বেলা যেমন বাগানের কাজ, ল্যাবরেটরির কাজ, রাতের বেলা তেমনি গ্রহনক্ষত্র দেখে আকাশ বিহার।

মানুষ কেবল মাটির জীব নয়, সে আকাশেরও জ্যোতিষ্ক। ধর্ম বলতে তিনি বোঝেন মাটি আর আকাশ এই দুটি মেরুর প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই তিনি অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ভক্তিভরে পাঠ করেন। গীতা চণ্ডীর ধার ধারেন না। পেনসন নিলে লোকে ধর্মগ্রন্থ পড়ে কাটায়। তিনি ও ভাবে জীবন ক্ষয় করতে চান না। যে জগতে জন্মেছেন তার দুই মেরুর প্রতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করে জীবন অতিপাত করবেন।

কিন্তু চাকরিতে থেকে এসব চলে না। বিশেষ করে বদলির চাকরিতে। আগে স্থির হয়ে বসতে হবে একটা ঠিকানায়। যেখানে তিনি পরের নফর নন। তিনিই মালিক। এত দিন তাঁর জীবনের পোস্টকার্ড সেখানে পৌঁছয়নি। কবে পৌঁছবে কে জানে!

অতুন উৎসুক হয়ে শুনছিল। যেন ওটা তারই জীবনস্বপ্ন। বলল, "আর কোনো শখ নেই আপনার? এই কি সব?"

বর্ধন অন্যমনস্ক ভাবে গড়গড়া টানতে টানতে বললেন, "শখের কি সীমা আছে! এই যে পাখীগুলো সাইবেরিয়া থেকে শীতকালে ফিরবে এদের জন্যে একটা এভিয়ারি থাকলে এরা

শীতকালটা আমার প্রতিবেশী হয়ে কাটাত। আমিও চিনে রাখতুম এদের। কে এলো, কে গেল, কে ফিরল, কে ফিরল না, জেনে রাখতুম। এরাও তো এক একটি ব্যক্তি। এক ঝাঁক পাখী বললে তো এদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না।”

অতনু স্বীকার করল। কী চমৎকার আইডিয়া। এভিয়ারি। ঠিক অর্থে চিড়িয়াখানা।

“তারপর মাছ কেবল আমরা ধরতেই জানি, খেতেই জানি। মাছ সম্বন্ধে কোনো নিরাসক্ত কৌতূহল নেই। মাছও তো একটা প্রাণী, আমাদেরই মতো। প্রাণরহস্য কেন যে মৎস্যরূপে জলচর হয়েছে, মনুষ্যরূপে স্থলচর, কী করে আমরা বুঝব যদি দিনের পর দিন না দেখি, ছোট থেকে না দেখি। মৎস্যকে বলা হয় আদি অবতার, কিন্তু অবতারের জন্যে মন্দির কই? মালিক, আপনি হলে কী বানাতেন?”

‘মল্লিক’ হয়েছে ‘মালিক’। ওটা ইংরেজী ঢং।

অতনু বলল, “ফিশারি।”

বর্ধন গড়গড়া ফেলে দুই হাত তুলে বললেন, “আরে না, না। ফিশারি নয়। আমি ফুলের চাষ ভালোবাসি, মাছের চাষ না। আমি নিরামিষাশী।”

“তা হলে কি—” শব্দটা অতনুর জিবের আগায় দুলছিল। কিন্তু কিছুতেই ছিটকে পড়ছিল না। ল্যাটিন শব্দ।

“য়্যাকোয়ারিয়াম।” বলে বর্ধন হাসতে লাগলেন। বিলেতফেরতের উপর এক হাত নিয়ে তাঁর অন্তরে উল্লাস। এই দেখ, য়্যাকোয়ারিয়াম কাকে বলে জানে না!

অতনু ভাবছিল, "এই কথাটা আমারো ছিল মনে কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।" মুখ ফুটে বলল, "গ্র্যাণ্ড! গ্র্যাণ্ড! আমার যদি সাধ্য থাকত তা হলে আমিও আপনার সহকারী হতে পারতুম। উদ্‌ভিদ্‌ আর পক্ষী আর মৎস্য। তার উপর গ্রহনক্ষত্র। বাকী রইল কী?"

বর্ধন হৃষ্ট হয়ে বললেন, "বাকী রইল একটি সহকারী। আমি একা ক'টা দিক দেখব! তা বলে আপনাকে আমি প্রত্যাশা করব না। আপনার কত বড় ভবিষ্যৎ। মালিক, আপনার যখনি ইচ্ছা হবে দু'এক মাস ছুটি নিয়ে আমার অতিথি হবেন, ইতস্তত করবেন না। মানুষের সঙ্গও তো আমার দরকার।"

অতনু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল, বলল না "কেন? আপনার পরিবার?"

অতনু যদিও স্বামীস্ত্রী দু'জনের জন্যে দু'খানা কার্ড রেখে এসেছিল বর্ধন তা সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাকে আলাপ করিয়ে দেননি। ভদ্রমহিলা কোনোদিন ক্লাবে আসেন না। বাড়ীতেও অতনুর সামনে বেরোন না। মনে হয় প্রাচীনপন্থী। অথচ বর্ধন এদিকে দিব্যি সাহেব। রোজ টেনিস খেলা বিলিয়ার্ড খেলা চাই। খেলেনও ভালো। অতনুকে খেলা শেখান। সে কেবল কাজকর্মের নয় খেলাধূলারও শিক্ষানবীশ।

এর কিছু দিন পরে অতনু বদলি হয়ে গেল। বর্ধনের সঙ্গে দেখা তখনকার মতো বন্ধ। বছর দুই পরে অন্য এক জেলায় আবার তাঁকে পাওয়া গেল তেমনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে।

কিন্তু অতনু আর তাঁর সহকারী শাসক নয়, এবার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি থাকেন সদরে, সে মফঃস্বলে। তার হাতে একশো রকম কাজ, খেলবে কখন, আর খেলবেই বা কার সঙ্গে? বর্ধনের মতো কেউ থাকলে তো? তবে খুব ঘোরাঘুরি করে।

বর্ধন কয়েক বার পরিদর্শনে এলেন। সেও কয়েক বার জেলা বোর্ডের মিটিং উপলক্ষে দেখা করে এলো। কিন্তু আগের মতো একসঙ্গে বেড়ানো, এক বাংলোয় নাইট হল্‌ট ইত্যাদি হলো না। ক্লাবের সেই নিত্য মেলামেশাও আর হবার নয়।

তবে তিনি অতনুকে বাড়ীতে ডেকে খাওয়ালেন। তাঁর স্ত্রী বসলেন না, কিন্তু দর্শন দিয়ে গেলেন। নামমাত্র একটু আলাপ হলো। ইতিমধ্যে অতনুর বিয়ে হয়েছিল, তার স্ত্রী বর্ধনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন।

সেদিন খেতে খেতে অতনু জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ বার্ডন, আপনার সেই ব্যারাকপুরের বাগানবাড়ীর কী খবর?"

বর্ধন করুণ হেসে বললেন, "ওঃ মনে আছে, দেখছি।"

অতনু বলল, "মনে থাকবে না? কত বড় একটা কল্পনা। আমি তো আপনারই পদাঙ্ক অনুসরণ করব ভেবেছি। পোস্ট কার্ডের মতো বার বার রিডাইরেক্‌টেড হতে ভালো লাগে না। ইচ্ছা করে কোথাও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে।"

"এরই মধ্যে।" বর্ধন কতকটা অন্তরঙ্গ ভাবে বললেন, "ক'বারই বা বদলি হয়েছেন আপনি! বদলির দুঃখ কতটুকুইবা জেনেছেন! দাঁড়ান, ছেলেমেয়ে হোক, সপরিবারে লটবহর

নিয়ে মেদিনীপুর থেকে নোয়াখালীতে বদলি হোক, নোয়াখালী থেকে দিনাজপুরে। ছেলেমেয়ের পড়াশুনার বয়স হোক। স্কুল থেকে বছরের মাঝখানে নাম কাটিয়ে নিতে হোক। সব বাকী আছে, মালিক। সব বাকী আছে। আরো বাইশ তেইশ বছর বন বন করে না ঘুরলে লাটিম স্থির হবে না। তার আগে পেনসন হবে না।"

এবার তাঁর দিকে ভালো করে তাকাল অতনু। সেই মানুষই। কিন্তু কেমন যেন মন-মরা। কী যেন বলতে চান অতনুকে। বলতে ভরসা পাচ্ছেন না। রাশভারি লোক। দ্বিগুণ বয়সী অতনুরও সাহস হয় না ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করতে।

তবু একবার তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দিতে হাল কামরায় বসে জিজ্ঞাসা করল অতনু, "আপনার ডিভিজনাল কমিশনার হতে কত দেরি ?"

"ক্ষেপেছেন। আমাকে করবে কমিশনার!" বর্ধন হর্ষ প্রকাশ করলেন না। ব্যঞ্জিত করলেন বিষাদ। "কমিশনার আমাদের সার্ভিস থেকে মাত্র একজনকেই করে। ব্যারেটকে করেছে। কোন গুণ দেখে জানিনে। বোধ হয় শ্বেত বর্ণ দেখে।"

হাহাকারের মতো শোনাল। সারাজীবন গাজরের পিছনে দৌড়নোর পর দেখা গেল গাজর নাগালের বাইরে। গাধা বনে গেছেন বর্ধন।

"কোথাকার পচা কমিশনার চাকরি!" অতনু সান্ত্বনা

দিতে গিয়ে বলল, "তার জন্যে মন খারাপ করে কে! আমি হলে লাথি মেরে চলে যেতুম। আপনার যখন অমন একখানা বাগানবাড়ী রয়েছে তখন কিসের ভাবনা! পেনসন তো কবে থেকে পাওনা হয়ে রয়েছেই।"

বর্ধন বললেন, "আমি ইস্তফা দিতে চেয়েছিলুম। চীফ সেক্রেটারি পিঠে চাপড় মেরে বললেন, বার্ডন, ডোণ্ট টেক ইট টু হার্ট। তোমাকে আমি আবগারি কমিশনার করে দিচ্ছি। আমি বললুম, থ্যাঙ্কস ভেরি মাচ। কিন্তু আরসুলো যেমন পাখী নয় আবগারি কমিশনার তেমনি কমিশনার নয়। আমাকে মানে মানে বিদায় হতে দিন। আমি বুঝেছি যে এ রাজ্যে শাদা চামড়ারই অগ্রভাগ। নইলে ব্যারেট আমার চেয়ে কোন গুণে যোগ্যতর!"

অতনু ব্যথা বোধ করছিল কেবল তাঁর জন্যে নয়, ভারতীয়দের সকলের জন্যেই। বলল, "কোন গুণে যোগ্যতর তা কি আপনি জানেন না, মিঃ বার্ডন? সন্ত্রাসবাদীদের শায়েস্তা করতে ব্যারেট যতটা মজবুৎ আপনি কি ততটা, না আমি ততটা? আমাদের কাছ থেকে সরকার কী পেতে পারে, কতটুকু পেতে পারে, এই সঙ্কটে? কেন তা হলে আপনাকে কমিশনার করবে, বা আমাকে ভালো একটা মহকুমা দেবে?"

বর্ধন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝি সবই। চারুসদয়কে যা দিল না আমাকে তা দেবে, ভাবাই ভুল হয়েছিল আমার। কিন্তু এদিকে আমি করি কী! অকারণে অপেক্ষা করতে করতে বয়স গড়িয়ে গেল। যে ধরণের জীবন আমি চেয়েছি

তার রসদ জোগাড় করতে করতেই জীবন ফুরিয়ে এলো। বাগানবাড়ীতে বসব যে, শরীরে দম কই! ঘড়ি আর ক'দিন টিক টিক করবে! এমন একটা অবসাদ বোধ করছি যে ইস্তফা দেবার মতো উদ্যোগটা পর্যন্ত নেই। ব্যারেটের অধীনে কাজ করতে হলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছুটি নেব।"

যা বলেছিলেন তাই করলেন বর্ধন। প্রথমে নিলেন চার মাস ছুটি। তার পরে আরো চার মাস। তার পরে আরো। আরো। আরো। দেশে তো কেবল সন্ত্রাসবাদ বলে একটিমাত্র সমস্যা নেই। কমিশনারের তো কেবল ওই একটিমাত্র ভাবনা নয়। রেভিনিউ সংক্রান্ত আইনকানুন তাঁর মতো বোঝে খুব কম লোক। ব্যারেটটা তো অঘা। সরকার মুশকিলে পড়লেন। কিন্তু দু'জনকে দুটো কমিশনার পদ দেবার উপায় ছিল না। বর্ধনকে অবসর দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে রায়-বাহাদুর খেতাব।

অতনু তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ছুটি নেবার সময় থেকেই। দেখা হতো না। চিঠিপত্র লেখালেখিও না। লোকমুখে শুনত তিনি ব্যারাকপুরের কাছে ফার্ম করে বসবাস করছেন। কেউ কিছু বলতে পারত না সেখানে কিসের চাষ হয়, পাখী আসে কি না, মাছ আছে কি না, ল্যাবরেটরি হয়েছে কি না, দূরবীন রয়েছে কি না।

সাত ঘাটের জল খেয়ে অতনুরও অরুচি ধরেছিল। সেও আকাঙ্ক্ষা করছিল একটা ঠিকানা। যেখানে স্থির হয়ে বসবে। আর নড়বে না। বর্ধন তাকে মেদিনীপুর থেকে নোয়াখালী

বদলির ভয় দেখিয়েছিলেন। ভয়টা অমূলক নয়। ঘটলও অনেকটা সেই রকম। মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাওয়া গেল না। সারকিট হাউসে যদি বা থাকতে দিল চারদিকে গুর্খা ফৌজ। কখন যে কাকে অপমান করে তার ঠিক নেই। তিন মাস পরে নাজির এসে সবিনয়ে বলল, আপনি এখন আর-কোথাও সরে যান, সারকিট হাউসে অত দিন কেউ থাকে না। সোজা বাংলা, গলা ধাক্কা।

এটা এড়াতে গিয়ে আবার বদলি তিন মাস পরেই। যেখানে গেল সেখানেও গৃহহীন। দয়া করে তাকে একজন অনুপস্থিত অফিসারের কুঠিতে থাকতে দেওয়া হলো, কিন্তু যেই তিনি হাজির হলেন অমনি তাকে গাছতলায় যেতে বলা হলো। সে সময় যদি এক অর্ধপরিচিত আলাপী আমন্ত্রণ না করতেন তা হলে সত্যি সত্যি পথে বসতে হতো। তাকে, তার স্ত্রীকে, তার শিশুপুত্রকে। পরে একটা বাসা পাওয়া গেল বহু চেষ্টায়।

এই দুর্দিনে মনে পড়ত বর্ধনকে। মনে পড়ত তিনি যা বলেছিলেন। কিন্তু যোগাযোগ ছিল না। ক'টা দিনের পরিচয়। সরকারী চাকুরেদের কে কাকে স্মরণ রাখে। বর্ধন কি অতনুর সাহচর্য মনে রেখেছেন। তিনি এখন নতুন জীবন যাপন করছেন। পিছন ফিরে কেনই বা তাকাবেন সরকারী চাকরির ছাড়া খোলসটার দিকে !

বছর ছয়েক বাদে আবার দেখা হয়ে গেল বর্ধনের সঙ্গে অতনুর। তিনি পুনশ্চ চাকরি নিয়েছেন। সরকারী নয়,

জমিদারি। জমিদারটি ভালো। তাঁর উপরে জমিদারির ভার দিয়ে কাশীবাস করছেন। তিনিই সর্বেসর্বা। যা করেন তাই হয়। প্রজাদের জন্যে হাসপাতাল ইত্যাদি খুলেছেন। কৃষি-ক্ষেত্র, বীজভাণ্ডার, সার সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। লেখাপড়ায় তাঁর তেমন বিশ্বাস নেই, লেখাপড়া শিখলে কেউ হাল লাঙল ধরতে চায় না, জমিদারি উঠিয়ে দেবে বলে শাসায়। তাই স্কুল ইত্যাদির অবস্থা যথাপূর্ব।

"কিন্তু আপনার নিজের ঠিকানার কী হলো ?" জিজ্ঞাসা করল অতনু। ক্লাবে টেনিস খেলে একসঙ্গে বসে শীতল পানীয় সেবন করতে করতে।

"ওঃ! আমার সেই ব্যারাকপুরের মালঞ্চের কথা জানতে চাইছেন।" যেন কোন অতীতের কথা। বিষণ্ণ মুখে বললেন, "পড়ে আছে। কেউ যদি ইজারা নিতে রাজী হন সস্তায় দিতে পারি। বিক্রি করতে মায়া হয়, কিন্তু আপনার মতো কাউকে পেলে তাও করতে পারি। বেশী দাম নেব না। নিলে তো মাড়োয়ারীকে বেচতে পারতুম। এই মুহূর্তে।"

ব্যাপারটা কী ? কৌতূহলী হলো অতনু।

ছুটি নিয়ে বর্ধন সেইখানেই ঠিকানা গেড়ে বসেছিলেন। নড়বার অভিপ্রায় ছিল না। কাজও অনেক দূর এগিয়ে গেছল। ফুলের চাষ। মৌমাছি পালন। ল্যাবরেটার। কিন্তু অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত ভাব মনে এলো। কী! অত কালের চাকরিটা সত্যি সত্যি শেষ হয়ে গেল! সত্যি সত্যি শেষ!

ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকল দিনগুলো। কাছারি নেই, নথিপত্র নেই, আরদালি চাপরাশি নেই, উকিল মোক্তার নেই, নাজির নেই, পেশকার নেই। তা হলে আছে কী? আছে কী? সামান্য কয়েকটি চাকর মালী। এদের নিয়ে টুকটাক কাজ করে যাওয়া একেবারে অন্য জাতের জিনিস। পাড়া গমগম করছে না, হাজার জন সেলাম ঠুকছে না, সিপাহী পাহারা দিচ্ছে না, ট্রেজারির লক্ষ লক্ষ টাকা দেখে ভ্রম জাগছে না যে সব আমার ধন। আমিই কুবের। কোথায় সেই রাজসিক জীবন, আর কোথায় এই বনবাস!

সন্ধ্যাবেলা আরো খারাপ লাগে। ক্লাব নেই, টেনিস নেই, সাথী নেই, আড্ডা নেই। এখানে মেশবার মতো লোকই বা কোথায়! মিশতে হলে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে মিশতে হয়। তারা কাজে বহাল আছে, তারা কাজের লোক। আর ইনি তাদের মতে বুড়ো হাবড়া। কৃপার পাত্র। ঠিক বনিবনা হয় না। যা পিছনে ফেলে এসেছেন তার জন্যে পিছু হটতে যাওয়া বৃথা। এগিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু যতই এগিয়ে যান ততই নিঃসঙ্গ বোধ করেন। সবচেয়ে দুঃখ পেলেন যে দিন দেখলেন তাঁর স্ত্রী সমাজের অভাবে হাঁপিয়ে উঠেছেন। আর তিষ্ঠোতে পারছেন না। ছেলেমেয়েরা তো আগে থেকেই ছেড়েছিল। এবার ছেড়ে গেলেন স্ত্রী। থাকলেন গিয়ে কলকাতায় মেয়ের কাছে। অজুহাত, নাতি হয়েছে।

আত্মবিশ্বাস কমে আসছিল। স্ত্রীবর্জিত হয়ে একেবারে দমে গেলেন বর্ধন। কাকে নিয়ে জীবন কাটবে। জীবনটা কি

তাঁর একার জীবন। না তাঁর প্রিয়তম ও নিকটতম জনেরও। চিন্তা করতে করতে একদিন অসুখে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী গিয়ে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে এলেন কলকাতা। কলকাতায় তিনি হলেন নজরবন্দী।

অন্যান্য পেনসনারদের মতো তিনিও লেকের ধারে এ-বেলা ও-বেলা বেড়ান আর পরস্পরের সঙ্গে গল্পগুজব করেন। তাঁরা চলে এসেছেন বলে গবর্নমেন্ট আর ঠিকমতো চলছে না। চালাবে কে? এ কি অপোগণ্ডদের কাজ! ছাগল দিয়ে ধান মাড়াই হয় কখনো! যত সব মোচলমানকে বসিয়ে দিয়েছে তক্তে। সিরাজুদ্দৌলা ফিরে এলো? না মীরজাফর? কেউ যদি একটি বার তাঁদের পরামর্শ চাইত! তাঁরা বেঁচে থেকেও ভূত।

বর্ধনও আর কিছু দিন পরে অতীত কালের সামিল হয়ে যেতেন, যদি না হঠাৎ বোর্ড অফ রেভিনিউ থেকে তাঁর কাছে বার্তা আসত। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ যে জমিদারির দায়িত্ব বইতে নারাজ তিনি কি দয়া করে তার ভার নেবেন? তিনি বিবেচনা করলেন। বারো লাখ টাকা দেনা। সম্পত্তির কতক যুক্ত-প্রদেশে, কতক বেহারে, কতক ওড়িশায়, কতক আসামে, বাকীটা বাংলায়। মাসে পনেরো দিন সফর করতে হবে। উপযুক্ত ম্যানেজারের হাতে পড়লে এখনো কিছু আশা আছে। কিন্তু বোর্ডের অধীনে চাকরি করবেন না বর্ধন। কমিশনার বা কালেক্টরের অধীনে তো নয়ই।

অবশেষে একটা নিষ্পত্তি হলো। বর্ধন ভার নিলেন নিজের শর্তে। বিনা খরচায় বাড়ী ও গাড়ী পাওয়া গেল কলকাতা

শহরে। হেড অফিস কলকাতায়। তার আকার প্রকার আসবাবপত্র কেরানী ও পিয়নসংখ্যা চার্নক প্লেসের কমিশনার অফিসকেও হার মানায়। পরিচালনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটি দূর করে অপব্যয়ের ছিদ্রগুলো তিনি এক বছরের মধ্যেই রুদ্ধ করে দিলেন। সঞ্চয় বাড়তে থাকল। দেনা আপনা আপনি শোধ হয়ে এলো। তবে একদম শোধ করা বর্ধনের পলিসি নয়। তা হলে তো তাঁর কর্ম যাবে। তিনি এমন কষে হাল ধরলেন যে তাঁকে সরালেই নৌকাডুবি। ভালোই আছেন বর্ধন।

"কিন্তু," প্রশ্ন করল অতনু, "এই ঠিকানাই কি আপনার শেষ ঠিকানা ?"

"বলতে গেলে তাই," সিগরেটের কেস খুলে অতনুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন বর্ধন। সে মাফ চাইল। "ব্যারাকপুরে ফেরা আর হয়ে উঠবে না এ জীবনে। ওসব সাধ স্থগিত রইল পরজন্মের জন্যে। মালিক, আপনি পরজন্মে বিশ্বাস করেন ?"

ধর্ম সম্বন্ধে বর্ধনের মাথাব্যথা এই প্রথম। অতনু বুঝতে পারল যে ভিতরে ভিতরে বাঁধ ভাঙছে, ভাঙন ধরেছে। বলল, "অবিশ্বাস করবার মতো প্রমাণ যথেষ্ট নেই।"

"খাঁটি কথা। আমিও অবিশ্বাস করিনে। ওসব সাধ পরজন্মের জন্যে শিকেয় তোলা থাক। আবার যখন আসব তখন যেখান থেকে ছেড়েছি সেখান থেকে ধরব। এ জন্মে তার সম্ভাবনা দেখছিনে। নতুন করে আরম্ভ করার পক্ষে বয়সটা বড় বেশী হয়ে গেছে। আরো কয়েক বছর আগে পেনসন

নেওয়া উচিত ছিল। সেই যখন আপনার সঙ্গে প্রথম এ নিয়ে কথা হয়। তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে।”

অতনু জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাল।

“পথের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়, নইলে পথ চলা দায়। কিন্তু এমন লোক তো অনেক দেখি যারা পাথেয় না নিয়েই পথে বেরিয়ে পড়েছে। পাথেয় আপনি জুটে যাচ্ছে। আমার ছিল না এদের মতো অনিশ্চিতের উপর বিশ্বাস। আমি বিশ্বাস রেখেছি নিশ্চিতের উপরে। রসদের উপরে। টাকার উপরে। আগে সব রকমে প্রস্তুত হব, তার পরে পথে পা বাড়াব। এই করতে গিয়ে আমার বল ফুরিয়ে গেছে। কায়িক অর্থে নয়। এখনো আমার কর্মশক্তি অসীম। কিন্তু মানুষকে যা চালিয়ে নিয়ে যায় তা কর্মশক্তি নয়। কারণ মানুষ তো ষ্টীম ইঞ্জিন নয়। আর পথটাও রেল লাইন নয়। মানুষের চাই আরেক প্রকার দম। উৎসাহ। উদ্দীপনা। বার বার লোকসান দেবার ক্ষমতা। অজস্র লোকসান দেবার সামর্থ্য। আমি তো পাইপয়সার বাজে খরচ বরদাস্ত করতে পারিনে। এক সেকেণ্ড সময় বরবাদ হলে দুর্জয় রাগ করি। আমার মতো লোকের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হবে কে। বাস করতে কার ভালো লাগবে।”

অতনুর কানে হাহাকারের মতো বাজছিল তাঁর এইসব উক্তি। সেও মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল। বর্ধনকে আশা দিতে চায়। কিন্তু কিসের আশা দেবে? কী মনে করে বলল, “আর কি কোনো উপায় নেই?”

"আর কী উপায় থাকতে পারে! না, আর কোনো উপায় নেই।" বর্ধন হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন। "থাকলে আমি টো টো করে গাজীপুর হাজিপুর জঙ্গীপুর রঙ্গীপুর ঘুরে বেড়াতুম না। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতুম, যেখানে আমার ঠিকানা। কলকাতায় অর্ধেক দিন থাকি, সে শুধু হেড অফিসের কাজ ভালো করে দেখতে। নইলে ফাঁকি দেবে। চুরি করবে। মনে করবেন না যে নগরের আকর্ষণে থাকি।" স্বর নামিয়ে বললেন, "কিংবা পরিবারের।"

অতনু প্রস্তাব করল, "চলুন, আমার ওখানে আজ চারটি শাকভাত খাবেন।"

বর্ধন গলে গিয়ে বললেন, "আজ নয়। আরেক দিন। আপনার মেমসাহেবকে আমার সেলাম জানাবেন।"

পরের দিন তিনি সেলাম জানাতে এসেছিলেন। পাঁচ মিনিট বসেই বিদায় নিলেন। খানাটা সে যাত্রা তাঁর প্রোগ্রামের সঙ্গে খাপ খেলো না। কথা দিলেন যে এর পর এলে নিশ্চয় খাবেন। সেই আগেকার দিনগুলির মতো আনন্দ করবেন।

সেদিন তাঁকে মোটরে তুলে দেবার সময় অতনু জানতে চাইল, "সামনের দিকে তাকিয়ে দেখার মতো কিছুই কি নেই আপনার?"

তিনি একটু ভেবে বললেন, "থাকবে না কেন? এই তো সবে সূচনা। নাতি হয়েছে। নাতনি হবে। তাদের মানুষ করতে হবে। বিয়ে দিতে হবে। চাকরি জুটিয়ে দিতে হবে। সামনের বিশ বছর বেঁচে থাকলে আমার খাটুনির কমতি

কোথায়! মরব যখন, গাড়ীতে জোতা অবস্থায় টমটম গাড়ীর ঘোড়ার মতো মরব।"

মোটর চলে গেল বর্ধনকে নিয়ে। অতনুর হাতে লেগে রইল তাঁর প্রবল পাঞ্জার ঝাঁকুনি। বুড়ো হয়েছেন, তবু টেনিস খেলেন জোয়ানের মতো জোরসে। অতনু তাঁকে হারাই-হারাই করেও হারাতে পারল না। জিতলেন তিনিই।

এই শক্ত মানুষটা যে আরো বিশ বছর অক্লেশে বাঁচবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না অতনুর। তবে সে বাঁচা মনের মতো করে বাঁচা নয়। যার জন্যে সারা জীবন ধরে প্রস্তুতি।

নিজের কাজকর্মের ধান্দায় অতনু ভুলে গেছল বর্ধনকে। সত্যি কথা বলতে কি বর্ধনের গুরুত্ব তার কাছে লোপ পেয়েছিল। যিনি ফুলের বাগান করেন না, পাখীদের আশ্রয় দেন না, ল্যাবরেটরি নেই যাঁর, কিংবা নেই দূরবীন, তিনি এমন কী দৃষ্টান্তস্থল যে তাঁকে মনে রাখতে হবে! বর্ধন আছেন, কিন্তু সে বর্ধন আর নেই।

আবার বদলি হবার পর একদিন খবরের কাগজ খুলে হাঁ করে রইল অতনু।

"কী হয়েছে! কী ব্যাপার!" সচকিত হয়ে শুধালেন তাঁর স্ত্রী।

অতনু নির্বাক হয়ে কাগজখানা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। তিনি শোকের প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। যথারীতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে চিঠি লেখা হলো মিসেস বর্ধনকে। ও ছাড়া আর কী করবার ছিল!

অনেক দিন পরে কে যেন কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন, "অসুখ নিয়েই সফর করে বেড়াচ্ছিলেন। ডাক্তার ডাকেননি, পাছে ডাক্তার তাঁকে বিছানায় শুইয়ে রাখে। বাড়ীতে খবর পাঠাননি, পাছে বাড়ীর লোক এসে পাকড়ে নিয়ে আটক করে রাখে। জমিদারি সেরেস্তার খাতাপত্র পরীক্ষা করতে করতে আচমকা ঢলে পড়লেন। মুখে প্রগাঢ় প্রশান্তি।"

"আর তাঁর 'চেরি অরচার্ড'? সেটার কী হলো?"

"সেটা এক মাড়োয়ারী কিনে নিয়েছে। গাছগুলো কেটে জ্বালানি কাঠ বলে চালান দিয়েছে। মাঠ সাফ করে তার উপর কারখানা তৈরি করছে বনস্পতির।"

অতনু শিউরে উঠল বর্ধনের কথা ভেবে। পরজন্মে তিনি কী নিয়ে বাঁচবেন!

পরীর গল্প

ছেলেবেলায় রঙ্গন ও তার দিদি কাঞ্চন যে পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে ইস্কুলে যেত সে পথের দুই ধারে লোক দাঁড়িয়ে যেত। আর বলাবলি করত—

এরা কারা হে ?

এরা নতুন পোস্টমাস্টারবাবুর মেয়ে। কলকাতা থেকে এসেছে।

বল কী! দুই বোন ? কই, দেখতে তো দুই বোনের মতো নয় ?

একেবারেই না। বোধ হয় দুই মা।

হতে পারে দুই মা। হতে পারে দুই—।

চুপ, চুপ। শুনতে পাবে।

শুনতে পেলে রঙ্গনের ও কাঞ্চনের কানের গোড়া লাল হয়ে উঠত। কিন্তু কী করবে। তখনকার দিনে ইস্কুলের বাস্ তো হয়নি। আর ইস্কুলটাও হাই স্কুল হয়ে ওঠেনি। মেয়েদের ইস্কুলে মেয়েরা পড়াবে, না বুড়োরা পড়াবে, তাই নিয়ে তর্ক চলছিল তখনো। রাজপথে আট দশ বছর বয়সের মেয়েদের চলাফেরা একটা দেখবার মতো ব্যাপার ছিল।

তারপর ইস্কুলে পা দিয়েও দুই বোন আবার তেমনি

লোকজনের দৃষ্টি টেনে আনত। সহপাঠিনীরা ফিসফিস গুজগুজ করত—

দেখেছিস্ কেমন সুন্দরী! যেন ডানকাটা পরী।

পরী না ফরী। না ফরফরী।

না ফুরফুরী।

ওর নাম কাঞ্চন। ওর ছোট বোনের নাম রঙ্গন।

রঙ্গন না বেঙ্গন।

বেঙ্গন না ব্যাং।

আমি বলি ডানাকাটা বানরী।

দূর বোকা! বানরী কখনো ডানাকাটা হয়। বানরের কি ডানা আছে?

তা হলে ও ডানাকাটা ময়না।

না, না। অতটা কালো নয়।

তবে ডানাকাটা ময়ূর।

না, না। অতটা কুৎসিত নয়।

তবে ও ডানাকাটা পাতিহাঁস।

আসলে হয়েছিল কি, তাদের দুই বোনের চেহারায় বেশ কিছু বৈষম্য ছিল। এতখানি বৈষম্য বড় একটা দেখা যায় না। তা বলে কোথাও যে দেখা যায়নি তা নয়। রাজশাহী জেলার একটি বিশিষ্ট জমিদার বংশে দেখা গেছে। ভাই আর্য, বোন দ্রাবিড়। বোনের বিয়ে আটকায়নি। রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে রুপো।

পোস্টমাস্টার মশায়ের কিন্তু রুপোর ঘরে শূন্য। সেইজন্যে

একদিন তাঁর মা বলেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে, "বৌমা, তুমি আমার লক্ষ্মী। তুমি রত্নগর্ভা। তোমার বড় মেয়ের বড় ঘরে বিয়ে হবে। ও মেয়ে বেঁচে থাকলে হয়। কিন্তু—" তাঁর স্বর সহসা নেমে এলো—"ছোট মেয়েকে পার করতে ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর লাগবে। ব্রজ অত টাকা পাবে কোথায়? শেষে কি ডাকঘরের তহবিল ভেঙে হাতে হাতকড়া পরবে?"

পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালোবাসত যাকে সেই মানুষের মুখে এই উক্তি। রঙ্গন তা হলে কার কাছে সহানুভূতি পাবে? তখন তার বয়স এগারো কি বারো। বোঝে সবই। কিন্তু মেনে নিতে পারে না। কেন একযাত্রায় পৃথক ফল হবে। দিদি আর সে দু'জনেই স্বর্গ থেকে এসেছে। ভগবান তাদের পাঠিয়েছেন। তা হলে একজনকেই রাজ্যের সমস্ত রূপ উজাড় করে দিলেন কেন? একটুও পড়ে থাকল না আরেকজনের জন্যে। বেচারি দু'বছর পরে এসেছে বলে কি রূপলাবণ্যের তলানিটুকুও পাবে না?

দিদির সঙ্গে একসঙ্গে বেরোতেও তার লজ্জা করত। কাঞ্চন ওই অঞ্চলের সেরা সুন্দরী। যেমন তার রূপ তেমনি তার রং। তেমনি তার গড়ন। তেমনি তার বাড়ন। পাতলা ছিপছিপে দীঘল সরল, রজনীগন্ধার মতো শুভ্র, গোলাপের মতো পেলব, আঙুরের মতো স্বচ্ছ, শিরীষের মতো ফুরফুরে। খয়েরী চুল তার মতো আর কার আছে? নীল চোখের তারা তার মতো আর কোন্ মেয়ের? দিন দিন তার সৌন্দর্যের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। কত লোক আসছে তাকে দেখতে। কত

বাড়ীতে তার জন্যে আদরের আসন পাতা। ধন্য মেয়ে কাঞ্চন।

আর রঙ্গন? অমন যার দিদি সে কিনা বেঁটে খাটো মোটা শ্যামলা শুকনো খসখসে খাপছাড়া ভারী। এত ভারী যে ডানা থাকলেও সে উড়তে পারত না, পাতিহাঁসের মতো আস্তে হেঁটে বেড়াত। মনের দুঃখে সে খাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছে। তবু তার ওজন কমতে চায় না। খেলাধূলা করলে কমত। কিন্তু তার বয়সের মেয়েদের খেলাধূলা বারণ। ছাড় কেবল ঘরে বসে দশ-পঁচিশ খেলা বা তাস খেলা। তখনকার দিনে মেয়েদের বাইরের খেলা কোথায়?

রঙ্গনদের ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছল। ওটা মাইনর স্কুল। বাড়ীতে বসে থাকতে তো কেউ দেবে না। সংসারের কাজে রাত দিন খাটাবে। যাতে হয় সে গৃহকর্মনিপুণা, সূচীশিল্পদক্ষা। বিয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায়।

ব্রজদুর্লভ কলকাতার লোক। ছুটি নিয়ে বড় মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলেন ও কলকাতাদুর্লভ জামাতা লাভ করলেন। ওরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদি মুৎসুদ্দি বংশ। বনেদী বলে বনেদী! এখনো কলকাতার একটা রাস্তার দু'ধারে যতগুলো বাড়ী সব ক'টাই ওদের। ভদ্রমহিলারা ও পথ দিয়ে যান না, ভদ্রলোকেরা যান সন্ধ্যার পরে। দেহ ভাড়া হিসাবে যে টাকাটা দেন তার সিংহের হিস্‌সা যায় বাড়ীভাড়া হিসাবে।

ওরা কুবের আর ওদের ছেলেটি কার্তিক। কাঞ্চনের সঙ্গে রাজযোটক। এ বিবাহে সকলের মনে আনন্দ, কেবল

রঙ্গন প্রাণ খুলে প্রফুল্ল হতে পারে না। ছেলেমানুষ হলেও সে এইটুকু বোঝে যে দুনিয়ার সুবিচার কোথাও নেই, ন্যায়ধর্ম নেই। যারা ভালো তারা খেতে পায় না, তাদের মেয়েদের ভালো বিয়ে হয় না। যারা খারাপ তাদের অঢেল টাকা। তারা সুন্দরী মেয়েদের বিনা পণে বিয়ে করে নিয়ে যায়। তাদের ছেলেরাও তাই সুপুরুষ হয়। তাদের মেয়েরাও বিদ্যাধরী।

কিন্তু এর থেকে ওর সিদ্ধান্ত হলো অদ্ভুত। যেমন করে হোক ওকে রূপসী হতেই হবে। রূপ যদি আসে তবে ধনসম্পদও আসবে। অভাবের ঘরে ওর বিয়ে হবে না। হবে ঐশ্বর্যের ঘরে। যার সঙ্গে হবে সে হয়তো কার্তিক নয়। কাজ নেই অমন কার্তিকে। কিন্তু সে যেন দিদির বরের চেয়ে দীনহীন না হয়। লোকে যেন বলতে পারে যে, হাঁ, রঙ্গনেরও ভালো বিয়ে হয়েছে। হবে না কেন? ও মেয়ে কি কম সুন্দর নাকি?

ঠাকুরের উপর ওর বিশ্বাস টলেছিল। ও তাই একমনে ডাকতে লাগল পরীকে। যে পরীর গল্প ও ছেলেবেলায় পড়েছে। ও যেন সিণ্ডেরেলা। একদিন ওকেই ভালোবাসবে অচিন রাজপুত্র। পরী ইচ্ছা করলে কী না পারে। পরীর বরে রূপসী হওয়া এমন কী অসম্ভব!

রঙ্গন তাই পরীকে ডাকে। দিনরাত ডাকে। ডাকতে ডাকতে মাস কেটে যায়। বছর কেটে যায়। কেউ জানে না ওর এই গোপন কথাটি। সমবয়সিনী সখীরাও না। ওর স্থির বিশ্বাস ওর ডাক ব্যর্থ হবে না। পরীর আসন টলবে। পরী বলবে, যাই দেখি কে আমাকে ডাকছে। এসে দেখবে—রঙ্গন।

ওদিকে ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। যদি বা কেউ কালেভদ্রে দেখতে আসছিল রঙ্গনকে অচল টাকার মতো বাজিয়ে দেখে বলে যাচ্ছিল ফিরে গিয়ে খবর দেবে। খবর আর আসেই না। রিপ্লাই পোস্টকার্ড লিখলেও না। বয়স গড়াতে গড়াতে আঠারোয় ঠেকল। ঠাকুমা বলেন তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন যদি না ফোটে তো আর কোনো দিন বিয়ের ফুল ফুটবে না।

অগতির গতি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সং সাজিয়ে দেখানো হলো। কিন্তু ভবী ভোলে না। ভায়রা ভাই শিবপদবাবু বললেন, "দাদা, তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোন। তোমার মেয়ের যত ওজন ঠিক তত ওজনের তামার পয়সা জড় করে তাই দিয়ে ডার্বির টিকিট কেনো। একরাশ টিকিট কিনলে একটা লেগে যাবেই। তোমার ঘোড়া যদি ডার্বি জেতে তা হলে তোমার মেয়ের ভেড়া হতে দশ বিশ জন বাঙালীর ছেলে এগিয়ে আসবেই। তখন তুমি করবে স্বয়ংবর সভার আয়োজন।"

সমান ওজনের তামার পয়সা বলতে কয়েক হাজার চাঁদির টাকা বোঝায়। ব্রজদুর্লভ কোথায় পাবেন অত! তাঁর মেয়ে যদিও দুটি ছেলে তো অনেকগুলি। তাদের মানুষ করতে হবে না? ভদ্রলোক কোনো দিকে কোনো রকম সুরাহা না দেখে অবশেষে ঠিক করলেন যে ডাকঘরের কেরানী শরদিন্দুর গলায় রঙ্গনের মালা পরিয়ে দেবেন।

ছেলেটি ভালো। অতি সচ্চরিত্র। অতীব সাধু। ব্রজ-দুর্লভবাবুর উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। রঙ্গনকেও দেখে আসছে বহুদিন থেকে। তার কোনো রকম দাবী নেই। তার দোষের মধ্যে সে পিতৃমাতৃহীন। গ্রামে পৈতৃক ভদ্রাসন আছে, কিন্তু জমিজমার শরিক একাধিক। চাকরিই ধরতে গেলে সম্বল। আর চাকরি তো শেষপর্যন্ত পোস্টমাস্টারি।

কোথায় কাঞ্চনের বর ঘর ধনদৌলৎ দাসীবাঁদী নফর মোটর। আর কোথায় রঙ্গনের ভিখারী দিগম্বর। বিয়ের পরে থাকতে হবে কেরানীবাবুর আধখানা চালাঘরে, রাঁধতে হবে আধখানা ঝি'র সাহায্যে। ষষ্ঠীর কৃপাও তো হবে একদিন। তখন ছেলের জন্যে দুধ ঘি জুটবে না। সরু চালের ভাত জুটবে কি না কে জানে, যদি বিধবা বোনটোন এসে জোটে।

রঙ্গন প্রাণপণে পরীর নাম জপে। ওই তার হরির নাম। পরী ইচ্ছা করলে কী না সম্ভব! কেন তবে সে শরদিন্দু কেরানীর বৌ হয়ে দিদির দাসীবাঁদির সমান হতে যাবে! না, সে বিয়ে করবে না।

২

পরী একদিন সত্যি দেখা দিল। স্বপ্নে।

এই তো সেই পরী। সেই রূপকথার পরী। কেতাবের ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। দেখছ না কেমন বড় বড় দুটি ডানা! এমন ডানা কি মানুষের হয়!

পরী বলল, "বাছা রঙ্গন, তুমি কী চাও? কেন আমাকে অত করে ডাকছিলে।"

রঙ্গন হাঁটু গেড়ে বসে হাত যোড় করে বলল, "পরী, আমার বড় দুঃখ। আমার রূপ নেই বলে এরা আমাকে ঝি'র মতো খাটায়। বিয়ে দিলে যার হাতে দেবে তার ঘরেও ঝি'র মতো খাটতে হবে। আমার দিদির কেমন বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকে। কিচ্ছু করতে হয় না। সব কাজ করে দেয় এক কুড়ি ঝি চাকর। দিদির বাড়ীর কুকুর বেড়ালও আমাদের চেয়ে ভালো খায়, ভালো পরে। তাদেরও গরম জামা আছে, শীতকালে গায়ে দেয়। পরী, দিদির আমার এক গা গয়না। সিন্দুকে আরো কত আছে। তার লেখাজোখা নেই। আর আমার দেখছ তো? এই পার্শী মাকড়ি আর সরু সরু চুড়ি। পরী, আমার তিনখানামাত্র শাড়ী, বাইরে বেরোব কী পরে? একখানাও কি রেশমের। আর ওদিকে দেখ গিয়ে দিদির কত বড় বড় আলমারি আর তোরঙ্গ শুধু শাড়ীতে পোশাকে ঠাসা। পরী, দিদির ছেলেমেয়েদের দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে। যখন যা চায় তখন তা পায়, ক্ষীর সর ননী মাখন সন্দেশ রসগোল্লা। আর আমার যদি ছেলে হয় সে কি এক ফোঁটা দুধ খেতে পাবে, ভেবেছ?"

পরী হেসে বলল, "তা হলে তুমি কী চাও, তাই বল।"

রঙ্গন বলল, "কী না চাই! সব চাই। বর চাই ঘর চাই ধন চাই জন চাই। কিন্তু সকলের আগে চাই রূপ। দিদির

মতো রূপ। পরী, তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর আমাকে যা দিলেন না তুমি আমাকে তা দাও। রূপ দাও। বর দাও। ঘর দাও। ধন দাও। জন দাও। সুখ দাও।”

পরী বলল, “তুমি যে আমাকে মহা বিপদে ফেললে, রঙ্গন। আমি কি ভগবান, না ভগবানের সমান! আমি তোমাকে সব কিছু দেব কী করে! দিলে দিতে পারি একটি জিনিস। সেটি কোন জিনিস তা তুমি ভেবেচিন্তে বল। মনে রেখো, একটির বেশী নয়। ঐ একটি নিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। আর আমাকে ডাকতে পারবে না।”

রঙ্গন বলল, “বেশ। তবে আমাকে রূপ দাও। দিদির মতো রূপ।”

পরী বলল, “তথাস্তু।” এই বলে আকাশে মিলিয়ে গেল।

রঙ্গন জেগে দেখল, কেউ কোথাও নেই। ওটা নেহাৎ একটা স্বপ্ন। স্বপ্ন কি সত্য হতে পারে! সে একটু একটু করে ভুলে গেল স্বপ্নের সব কথা।

মাস কয়েক পরে তার পিসী পশ্চিম থেকে এলেন ভাইয়ের অসুখ শুনে। ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমেই বললেন, “ও কে! কাঞ্চন! তুই কবে এলি? তোর শাশুড়ী আসতে দিল? কিন্তু ও কী! তোর সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?”

রঙ্গন প্রণাম করে বলল, “আমাকে চিনতে পারছেন না, পিসিমা? আমি যে রঙ্গন।”

পিসী বিশ্বাস করলেন না। রঙ্গন কখনো এত সুন্দর হতে পারে! ভিতরে গিয়ে বললেন, "রঙ্গনকে দেখছিনে কেন? আয় রে রঙ্গন। তোর জন্যে কী এনেছি, ছাখ।"

এমন সময় রঙ্গনের মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, সত্যিই তো! কাঞ্চন! আরো কাছে গিয়ে চিবুকটি তুলে ধরলেন। না, কাঞ্চন নয়, কিন্তু কাঞ্চনের দোসর। "ওমা, আমার কী হবে গো! ঠাকুরঝি, তুমি জাদু জান? আমার রঙ্গন কেমন করে কাঞ্চন হলো? তোমরা কে কোথায় আছো গো, দেখবে এস।"

অসুস্থ শরীরে উঠে এলেন ব্রজদুর্লভ। ঠাকুরঘর থেকে ছুটে এলেন তাঁর মা। বাড়ীর ছেলেরা যে যেখানে ছিল হৈ চৈ করে এলো। সবাই দেখল রঙ্গন কেমন করে কাঞ্চন হয়ে হয়ে গেছে। অবশ্য বেমালুম এক নয়। বোঝা যায় এ রঙ্গন। এর বয়স কম। এ কুমারী।

তখন সে যে কী উল্লাস তা বলবার নয়। ঠাকুমা বললেন, "আমিই তোদের সকলের আগে লক্ষ করেছি! করেছি অনেক দিন। ও যা হয়েছে একদিনে হয়নি। তা হলেও মানতে হবে এমনটি আমার জীবনে আমি দেখিনি।"

পিসিমা বললেন, "এ যেন গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি।"

মা বললেন, "থাক, থাক, বলতে নেই। মেয়ের যা কপাল। সইলে হয়!"

বাপ বললেন, "ওকে আমি কলকাতা নিয়ে যেতে চাই। ওর উপযুক্ত বর এখানে বসে থেকে মিলিবে না। ছুটির

দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি। ওরে একটা টেলিগ্রামের ফর্ম নিয়ে আয় তো রে।”

কলকাতায় রঙ্গনের জন্যে চেষ্টা চলতে লাগল। একদিন খুব মজা হলো। কাঞ্চন তাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেছে। সে তার দিদির খোকাখুকুদের সঙ্গে খেলা করছে। এমন সময় জামাইবাবু এসে ডাকলেন, “কাঞ্চী, শোন তো।”

রঙ্গন বলল, “বা! আমি কাঞ্চী হতে গেলুম কবে! আমি যে রঙ্গন।”

জামাইবাবু বললেন, “রঙ্গন! কী আশ্চয্যি! আমারই চিনতে ভুল হয়!”

তার পর কাঞ্চন এসে পড়ল। যখন জামাইবাবু ওর সামনেই ওর বোনকে আদর করে বললেন “ছোট গিন্নী।” রসিকতা করে বললেন, “বড় গিন্নী না থাকলে বড় গিন্নীর কাজ ছোট গিন্নী চালাতে পারবে।”

এর পরে আপনার স্বার্থে কাঞ্চনের কর্তব্য হলো বোনকে পাত্রস্থ করা। চেষ্টা করতে করতে মনের মতো বর পাওয়া গেল ক্ষৌণীশচন্দ্রকে। উঁচু পায়া-ওয়ালা সরকারী কর্মচারী। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে প্রমোশনের সাধনায়। তবে তাঁকে দেখলে চল্লিশ বলে মনে হয় না। আর হলেই বা কী আসে যায়! রঙ্গনও তো ডাগর হয়েছে। বাঙালীর মেয়ে কি অত লম্বা হয়! যে-ই দেখবে সে-ই বলবে পাঞ্জাবী কি কাশ্মীরী। পাতলা ছিপছিপে হালকা ফুরফুরে। রজনীগন্ধা। গোলাপ। আঙুর। খয়ের। সেইসব উপমানের সঙ্গে উপমেয়।

ক্ষৌণীশচন্দ্র মনের মতো বৌ পেয়ে গেলেন। তিনি যে এত দিন অবিবাহিত ছিলেন এ যেন রঙ্গনেরই প্রতীক্ষায়। যে তাঁর মানসী বধূ। যাকে তিনি কোথাও খুঁজে পাননি। পেলেন এত দিন পরে। আকস্মিক ভাবে।

বিয়ের পর রঙ্গন তার স্বামীর সঙ্গে পুনা চলে যায়। এমনিতেই সে গৃহকর্মনিপুণা, তার ঘরসংসার সে অল্পদিনের মধ্যে বুঝে নিল। চাকরগুলো দু'হাতে লুট করছিল। বাজার খরচ নাকি দিনে দশ টাকা। দশ টাকার নোটের একটা টাকাও বাজার থেকে ফিরত না। রঙ্গন সেটাকে চোখ বুজে করে দিল পাঁচ টাকা। তরে থেকেও ফিরতে লাগল বারো তেরো আনা। নইলে নোকরি ছুটে যাবে। দেখাশুনা করত রঙ্গন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তাই রান্নার স্বাদ বদলে গেল। ক্ষৌণীশ বললেন, "মা বেঁচে থাকতে খেয়েছিলুম মনে পড়ে। তার পর এই খাচ্ছি। মাঝখানের পনেরো বছর অনাহারে কেটেছে।"

কিন্তু পড়াশুনা তো সে সামান্যই করেছে। অত বড় সরকারী আমলার ঘরে মানাবে কেন? তাই তার জন্যে গভর্নেস বহাল হলো। খাস ইংরেজ মেমসাহেব। বুদ্ধিমতী মেয়ে। চটপট শিখে নেয় আর মনে রাখে। বছর দুই যেতে না যেতে দেখা গেল সে ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলছে। কোথাও এতটুকু বাধছে না। কী চমৎকার উচ্চারণ! তবে সে বিদ্বানদের সঙ্গ পারতপক্ষে এড়ায়। তর্কবিতর্কের ধার দিয়ে যায় না। অতিথিরা

গম্ভীরভাবে আলোচনা করছেন দেখলে সেলাইয়ের কাজ হাতে নিয়ে বসে। চোখ তুলে তাকায় না।

তার পর স্বামীর সঙ্গে একবার বিলেত ঘুরে আসতেই তার আদিপর্ব সাত সমুদ্রের জলে ভেসে গেল। যে সমাজে সে মিশত সে সমাজ তাকে জাতে তুলে নিল। সে না হলে পার্টি জমবে না। তাই নিত্য নিমন্ত্রণ। সে না হলে নাচ জমবে না। তাই অবিরাম সাধ্যসাধনা। বিস্তর খোসামোদ শুনতে হয় তাঁকে। তাতে যে তার মাথা ঘুরে যায় না এর কারণ সে তার দীনহীন অবস্থার দিনগুলি ভোলেনি, তাই অহঙ্কারী হয়নি।

তার একটা মস্ত গুণ সে সাধারণ গৃহস্থের পরিবারে আসাযাওয়া করে, অসুখের সময় ফলমূল কিনে দেয়, সুখের দিনে ফুল কিনে উপহার দেয়। সকলের সঙ্গেই সহৃদয় ব্যবহার করে, হোক না কেন গরিব কেরানী। শরদিন্দুকে সে বিয়ে করেনি বটে, কিন্তু তার মতো মানুষই বা ক'টা দেখেছে বা দেখছে! মনুষ্যত্ব তার নতুন সমাজে বিরল।

মাঝে মাঝে তার ভীষণ মন কেমন করত মা বাবার জন্যে। ঠাকুরমার জন্যে। ভাইগুলির জন্যে। কিন্তু ফিরে যাবার পথ খোলা ছিল না। সে গেলে তারা ওকে রাখবে কোথায়! অত বড় লোকের রানীকে! তারাও যে আসবে তা নয়। পুনা অনেক দূর। খেটে খাওয়া লোকের অত সময় কোথায়। আর খরচাই বা জামাইয়ের সংসার থেকে নেবে কেন?

একমাত্র কাঞ্চনের সঙ্গেই তার সমতা। কিন্তু কাঞ্চন কিছুতেই তাকে ডাকবে না। ছোট গিন্নীর উপর কর্তার যা নেকনজর। সেও কাঞ্চনকে আসতে বলবে না। ভিতরে ভিতরে বেশ একটু রেষারেষির ভাব। দিদির বোন বলেই তুলনায় রূপহীন দেখাত, নইলে কি কেউ কখনো মা বাপ তুলে মন্তব্য করত? ডানাকাটা পরীর সঙ্গে না দেখলে কেউ কখনো মিল দিয়ে বলত না যে ডানাকাটা বানরী। এখন অবশ্য সেও সমান সুন্দরী, সমান উচ্চ। তা হলেও কাজ কী দিদিকে ডেকে এনে? এ যেন খাল কেটে কুমীরকে ডেকে আনা। এদিকের কর্তারই হয়তো আফসোস হবে কী ভুলই করেছি বড় গিন্নীকে বিয়ে না করে!

কিন্তু একদিন এক অঘটন ঘটল। স্বামী কার সঙ্গে বিলেত পালিয়ে যাচ্ছে বলে বম্বে পর্যন্ত ধাওয়া করে এলো কাঞ্চন। ট্রেন থেকে টেলিগ্রাম করল রঙ্গনকে ক্ষৌণীশকে। এর দু'জনে জোরসে মোটর ছুটিয়ে দিল। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে খাড়া থাকল ক্যালকাটা মেল কখন আসে। কাঞ্চন নামল, তার কোলের ছেলেটি নামল, আয়া নামল, বেয়ারা নামল। কিন্তু পাখী দুটি উড়ে গেছে, ওদের 'কুপে' খালি। বন বন করে ফ্যান ঘুরছে। বার্থের গায়ে কার্ড আঁটা—মিস্টার য়্যাণ্ড মিসেস আর. সি. রায়।

বেচারি কাঞ্চন! মণিহারা ফণী। পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর। হাজার হাজার অচেনা লোকের সামনে। রঙ্গন তাড়াতাড়ি স্বামীর সঙ্গে কী পরামর্শ

করল। স্বামী তৎক্ষণাৎ মোটরে করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গন্তব্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স। দুই বোনে সদলবলে চলল তাজমহল হোটেলে।

৩

এত ক্ষণ যা বলা হলো তা গৌরচন্দ্রিকা। এর পরে আসছে আসল গল্প।

ক্ষৌণীশকে অনেক পেট্রোল পোড়াতে হলো। পুলিশকেও তাঁর খাতিরে কম নয়। জুহুতে ওদের আবিষ্কার করা হলো। কিন্তু গ্রেপ্তার করবে যে—কী অপরাধে?

পাশপোর্ট চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল মিসেস রায়ের চেহারা মিসেস রায়েরই মতো। অর্থাৎ রায়ের সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁরই ফোটো আঁটা।

"এক্স্‌কিউজ মী। আপনি কি মিসেস কাঞ্চনমালা রায়?" পুলিশের প্রশ্ন।

"আমিই।" ভদ্রমহিলার উত্তর।

এর উপর আর কথা চলে না। পুলিশ তো ভিজেবেড়ালের মতো পাশপোর্টখানা ফেরত দিয়ে তোবা তোবা করে সরে পড়ল। ক্ষৌণীশ ধরা পড়ে গেলেন। রমেশ শাসিয়ে বলল, "দেখে নেব। আমার স্ত্রীকে পুলিশ ডেকে এনে আমার স্ত্রী নয় বলে অপমান!"

সত্যি, কাজটা ঠিক হয়নি। ক্ষৌণীশ বোকা বনে গেলেন। রমেশ যে অত বড় পাষণ্ড হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি।

পাশপোর্ট অফিসে গিয়ে যার ফোটো দাখিল করেছে সে কোনো কালেই কাঞ্চনমালা নয়। সে কাঁকনমালা। কাঞ্চনমালার দাসী। দু'পাতা ইংরেজী পড়েছে, সাজগোজ করতে শিখেছে, চেহারায় রস আছে। এখন বিলেত গিয়ে অম্লানবদনে কাঞ্চনমালা রায় বলে পরিচয় দেবে, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সই করবে, একরাশ দলিল সৃষ্টি করবে। পরে এই নিয়ে আইন আদালত করতে হবে। কোর্টে দাঁড়াতে হবে দুই নারীকে। কে যে কাঞ্চনমালা কে যে কাঁকনমালা সাক্ষীপ্রমাণ নিয়ে সাব্যস্ত করতে হবে বিচারপতিকে। আর একটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা।

জাহাজ ছেড়ে দিল। কেউ আটকাতে সাহস পেলো না। জাহাজঘাটে যাবে বলে জেদ ধরেছিল কাঞ্চন। সে নাকি সাহেবকে বুঝিয়ে বলবে যে সে-ই সত্যিকার কাঞ্চনমালা। ওটা মিথ্যেকার কাঁকনমালা। ওর প্রকৃত নাম বিল্বদা। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ী। সাহেব যে কোন সাহেব তা সে জানে না, কিন্তু সাহেব যখন তখন নিশ্চয় সুবিচার করবে, সাহেব জাতটার উপর তার অগাধ বিশ্বাস।

ক্ষৌণীশ তাকে কোনো মতে নিরস্ত করতে না পেরে শুধু এই কথাটুকু বললেন, "সাহেব যদি দাবী করে যে ক্যাবিন যখন রিজার্ভ হয়েছে তখন যার নাম কাঞ্চনমালা তাকেই জাহাজে করে বিলেত যেতে হবে, তো উঠবেন আপনি জাহাজে ?"

"না। না। আমার বাছাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।" কেঁদে ফেলল কাঞ্চন। সে কী কান্না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে হাত পা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কান্না।

"আপনি না গেলে আপনার জায়গায় যেতে হয় আরেকজনকে। কাঞ্চন সাজতে হয় রমেশের সহযাত্রিণী হতে। ও বোধ হয় একা যেতে ভয় পায়।"

রঙ্গন চোখ টিপে স্বামীকে নিরস্ত করল। ভদ্রলোকের আড্ডা দেওয়া অভ্যাস। আমুদে লোক বলে সর্বত্র জনপ্রিয়। প্রমোশনের সেটাও একটা সঙ্কেত।

বম্বে থেকে ওরা পুনা গেল সবাই মিলে। কাঞ্চনের বুক ভেঙে গেছে। এবং রঙ্গন লক্ষ করে অবাক হলো যে রূপ উবে গেছে।

"দিদি, তোর রূপ গেল কোথায় ?

"আমার রূপ ! আমার রূপ আমি সাত ভাগ করে সাত ছেলেমেয়েকে দিয়েছি আর দিয়েছি তাদের বাপকে। ও কার্তিক ছিল। কন্দর্প ছিল না। আমার রূপ নিয়ে হয়েছে কন্দর্প। ও এখন আমার দেওয়া রূপ দেবে কাঁকনকে। আমার বাঁদিকে। দিনে দিনে সুন্দর হবে কাঁকন। আমার ছোঁওয়া দিয়ে সুন্দর। যে ছিল দাসী সে হবে রানী। যে ছিল রানী সে হবে দাসী।"

রঙ্গনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল এই উক্তি। মেয়েরা বিজ্ঞ হয় মেয়েদেরই অভিজ্ঞতা শুনে। পুরুষের পুঁথি পড়ে নয়।

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে কঞ্চনের সব সুখ ফুরিয়ে গেল। এখন তাকে বাঁচতে হবে তার বাছাদের মুখ চেয়ে। নইলে

ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ত, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ত, বাজার থেকে আফিং কিনে এনে খেত, কেরোসিন মেখে আগুন ধরিয়ে দিত, বিছানার চাদর ছিঁড়ে গলায় দড়ি দিত। বাঁদি হবে রানী। রানী হবে বাঁদি। ও হো হো!

"রংনী, আমার কি বুদ্ধি ছিল! রূপ থাকলে কী হবে! বুদ্ধি না থাকলে রূপও থাকে না রে। আর রূপ না থাকলে কিছুই থাকে না। না স্বামী, না সম্মান, না সম্পদ। আমি সোজা মানুষ। আমার ধারণা ছিল স্বামীকে যতগুলি সন্তান দেব তত বেশী ভালোবাসা পাব। সাতটি সন্তান দিয়ে সাত পাকে জড়াব। কই, তা তো হলো না রে। গেল আমার রূপ। সেইসঙ্গে স্বামীর ভালোবাসা। ও হো হো!"

দিদিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রঙ্গন ভাষা খুঁজে পেলো না। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। আর ভাবতে লাগল নিজের ভবিষ্যৎ।

"এমন হবে যদি জানতুম তা হলে কি আমি সাধ করে মা হতে যাই। হলে হতুম একবার কি দু'বার। আজকাল শুনি কত রকম নতুন নতুন উপায় বেরিয়েছে। দিদিমাদের মতো সাপখোপ খেতে হয় না। আমার শ্বশুরবাড়ীতেই ক'টি বুড়ী পাগল। কী সব খাওয়া হয়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাকেও সিঁদূরের মতো লাল-লাল কী একটা এনে দিয়েছিল। খাইনি। এনে দিয়েছিল ওই কাঁকন। ওই বিন্দা। খেলে বাঁচতুম না রে।

রঙ্গন এর মধ্যে রঙ্গীন হয়েছিল। বলল, "আমাকে চিঠি

লিখিস্‌নি কেন? আমার গভর্নেস আমাকে প্রথম থেকেই সাবধান হতে শিখিয়েছে। আমার তো হয় না।”

তাই তো। এটা কোনো দিন কাঞ্চনের মাথায় আসেনি। তার ধারণা ছিল রঙ্গন ঠাকুরদেবতা মানে না বলেই তার হয় না। মা ষষ্ঠীর রোষ।

“তা বলে কি একেবারেই হবে না রে?”

“হবে বই-কি। আগে তো জীবনটাকে উপভোগ করি। পঁচিশ বছর মাত্র বয়স। এ বয়সে মা হলে আমার ডানা কাটা পড়বে যে।”

“ও। তুই বুঝি ডানাওয়ালা পরী।”

“কেন? হতে দোষ কী? পরীদের ডানা থাকে কে না জানে? সেইটেই তো স্বাভাবিক। ডানাকাটা পরী শুনে শুনে তোর মাথা ঘুরে গেছে, তাই তুই বুঝতে পারিস্‌নে যে ওতে পুরুষদেরই সুবিধে। ডানাদুটি কেটে রেখে তোকে ওড়বার অযোগ্য করে তোলা হয়েছে। নইলে ওর সঙ্গে এক জাহাজে বিলেত যাবার কথা তো সত্যিকার কাঞ্চনেরই। তুই উড়তে জানিসনে তো উড়ো পাখীর সঙ্গে উড়বি কী করে! পুরুষ যে উড়ো পাখী এটাও কি জানতিস্ নে?”

কাঞ্চন ধিক্কার দিয়ে বলল, “বিল্বদা উড়ল। উড়বে বলেই বুঝি তিন তিন বার মা হতে হতে মা হলো না। আমি পারতুম না রে। আমার ডানা কাটা বলে আমার দুঃখ ছিল না। তবু তো পরী ছিলুম লোকের চোখে। এখন যে বানরী! ও হো হো!”

তা নেহাৎ ভুল বলেনি দিদি। রঙ্গনের মনের কথাটা কেমন করে দিদির মুখে এসেছে। এতকাল পরে শোধবোধ হলো ইস্কুলের সেই ডানাকাটা পরী ও ডানাকাটা বানরী বলে অন্যায় তুলনার। ওরে তোরা আয় রে, ইস্কুলের ছুঁড়িরা। দেখে যা কে পরী, কে বানরী। এখন যে পরী সে ডানাওয়ালা পরী। আরো এক কাটি সরেশ।

কাঞ্চন তার আর-সব খোকাখুকুদের কলকাতায় ফেলে এসেছিল। কোলেরটিকে নিয়ে আর ক'দিন ভুলে থাকা যায়! ওরা চিঠি লিখেছে, মা, তুমি জলদি এসো। তোমার জন্যে মন কেমন করছে। তা পড়ে কাঞ্চনের চোখে কোটালের বান ডাকল। আরব্য উপন্যাসের মায়া সতরঞ্চ পেলে সে দু'দিন দু'রাত্রের পথ দু'দণ্ডে পার হতো। তা যখন নেই তখন রেল-গাড়ীতেই উঠে বসতে হলো।

দিদিকে বিদায় দিয়ে এসে রঙ্গনের প্রথম কাজ হলো মেডকে নোটিস দেওয়া। মেড কথাটা ইংরেজী হলেও মানুষটি কোঙ্কনী। সব রকম গৃহকর্মে সাহায্য করত। রঙ্গনের প্রসাধনের পশ্চাতে থাকত তারই অদৃশ্য হস্ত। বয়স হয়েছে, বিয়ে হয়েছিল, স্বামী মারা গেছে। নিঃসন্তান। এত দিন তাকে সন্দেহ করেনি, সন্দেহের উপলক্ষ ঘটেনি। এই প্রথম মনে হলো যে সন্দেহ না করাটাই ভালোমানুষী। একদিন সে-ই হয়তো সাজবে রঙ্গনমালা দাস।

রঙ্গন তাকে বুঝিয়ে বলল যে আর্থিক অবস্থা মেড রাখতে অনুমতি দিচ্ছে না, মেড বলে কেউ থাকবে না, পদটাই ছাঁটাই

হবে। যাঁরা মেড রাখতে পারেন তাদের নামে চিঠি লিখে দেওয়া হচ্ছে সুপারিশ করে। লেডী কারসেটজী একবার জানতে চেয়েছিলেন কে অমন সুচারুরূপে সাজায়। তিনি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেবেন। ভয় নেই। ধন্যবাদ।

মেড চলে যাবার পর মনটা ফাঁকা হয়ে গেল। ছিল একটি সঙ্গিনী, যার সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা বলবলি হতো। এখন এমন একটিও মেয়েমানুষ রইল না যে অসুখে বিসুখে সেবা করবে বা কাছে বসবে। বান্ধবীরা যদি দয়া করে আসে তবে সেটা হবে দয়ার দান! তার উপর নির্ভর করা যায় কি? দূর সম্পর্কের কোনো এক বিধবা আত্মীয়াকে আনিয়ে নিলে মন্দ হতো না। কিন্তু বয়স্ক হওয়া চাই। স্বামীর চেয়েও বয়স্ক।

এই সূত্র ধরে পিসী এসে পড়লেন। থাকতেই এলেন। সঙ্গে একটি ছেলে। চাকরির খোঁজ করবে তা করুক। মেয়ে তো নয়। অরক্ষণীয়া কন্যা হয়ে থাকলে পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করা হতো। অত ভালোমানুষী ভালো নয়। দু'চার হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে দেওয়া তার চেয়ে ভালো। আর্থিক অবস্থা অনুমতি দিতে পারে।

৪

মরাঠা মেয়েদের মতো মাথায় কাপড় নেই, খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো। আর-সব বাঙালীর মেয়ের মতো। ওরই নাম রঞ্জন। ওর সঙ্গে ওর স্বামী ক্ষৌণীশ। সাহেবদের মতো ডিনার পোশাক পরা। ফিরছিল দু'জনে বিলিমোরিয়াদের সঙ্গে

ডিনার খেয়ে। আধ মাইলটাক রাস্তা। তাই মোটর ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটছিল। যাতে খানা হজম হয়। চাঁদনী রাত। তেমন শীত নেই। পথ প্রায় ফাঁকা।

"শুনলে তো কী বলছিল বিলিমোরিয়া তার মিসেসকে ?"

"কী বলছিল ?"

"বলছিল—"

"চুপ করে গেলে যে ? বল।"

"বলছিল তোমাকে লক্ষ করে নয়। মিসেস গুপ্তেকে লক্ষ করে।"

"কী বলছিল ? বল না ?"

বলছিল, "দেখছ তো মিসেস গুপ্তেকে। কেমন গ্রেসফুল ফিগার। কেমন ভরাট গড়ন। কেমন পরিপূর্ণ নারীত্ব।"

রঙ্গন উপহাস করে বলল, "পরস্ত্রীর প্রশংসা করতে পঞ্চ মুখ কি শুধু বিলিমোরিয়া ? না তার জবানীতে আর কোনো পুরুষ ?"

"আরে না, না। এ কি আমার উক্তি ? আমি কি বানিয়ে বলছি ? সাক্ষাৎ ঘোড়ার মুখ থেকে শোনা। বিলিমোরিয়া তার স্ত্রীকে বলছিল, শুনে এসে আমি আমার স্ত্রীকে বলছি। কেন বলছি তার একটু রহস্য আছে।"

"রহস্য ! শুনি কী রহস্য !"

"বাকীটুকু বললে আপনি বুঝতে পারবে। বিলিমোরিয়ার বক্তব্য হলো, যে নারী মা হয়েছে সে-ই অমন পরিপূর্ণা হতে পারে। কটাক্ষটা মাতৃত্ববিমুখ রূপসীদের বিরুদ্ধে। যেমন

মিসেস বিলিমোরিয়া। এ অঞ্চলের সেরা সুন্দরী—” এই পর্যন্ত বলে ক্ষৌণীশ তৎক্ষণাৎ কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে জুড়ে দিলেন, “নন যদিও।”

রঙ্গন কটমট করে তাকাল। “সরি। আমার ধারণা ছিল তুমি পরস্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখ না। মিসেস বিলিমোরিয়া নাকি সেরা সুন্দরী! মিসেস গুপ্তে নাকি পরিপূর্ণা নারী। গ্রেসফুল বলছিলে। না। আমি বলি, ডিসগ্রেসফুল।”

দাম্পত্য কলহ শয়নকক্ষে নয়, রাজপথে। ক্ষৌণীশ সেই যে চুপ মেরে গেলেন আর একটি কথাও মুখ থেকে বার করলেন না। আর রঙ্গন সেই যে বকম বকম শুরু করল তা চড়া গলায় না হলেও স্বামীর কানে হাতুড়ি পেটার মতো পটহবিদারক।

ক্ষৌণীশ বেচারার বয়স হলো ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ। আর আট ন'বছর বাদে রিটায়ারমেণ্ট। ছেলে হলে তাকে মানুষ করবেন কবে? সেইজন্যে তিনি কখনো উচ্চবাচ্য করতেন না। মনের খেদ মনে চেপে রাখতেন। কথাটা আজকেও তুলতেন না। বিলিমোরিয়া তুলেছিল বলে তিনি ও প্রসঙ্গ স্ত্রীর কানে পৌঁছে দিলেন। সংবাদদাতার মতো।

বিছানায় গিয়ে রঙ্গন কান্নাকাটি করল। কেন কাঁদছে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিল না। মুখ ফিরিয়ে থাকল। ক্ষৌণীশ বার বার মাফ চাইলেন। নাকে কানে খৎ দিলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। শেষে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে কপট নিদ্রায় নাক ডাকাতে লাগলেন।

রঙ্গন বলল, "ওগো শুনছ ?"

উত্তরে নাক ডেকে উঠল—ঙ। ঙ। ঙ। ঙ।

"শুনবে ?"

ঙ। ঙ।

"ওগো শোন।" ভারী মোলায়েম সুর।

ক্ষৌণীশ বললেন, "কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে। মিসেস বিলিমোরিয়া সুন্দরী নন। মিসেস গুপ্তে গ্রেসফুল নন। মিসেস দাস মিস ইণ্ডিয়া। কেমন ? হলো তো ?"

রঙ্গন অনুতপ্ত হয়ে বলল, "সত্যি, আমি খুব দুঃখিত। তোমার মনে কী ছিল আমি কেমন করে জানতুম ? কোনো দিন তো আভাস দাওনি। তুমি কি চাও যে আমাদের একটি খোকা হয় ?"

"না। না। আমি চাইব কেন ? আমার কি আর চাইবার বয়স আছে ? চাইলে তুমি চাইবে। চাও তো আর দেরি কোরো না। মানুষের সন্তানকে মানুষ করতে কমপক্ষে ষোল বছর লাগে। আমাদের স্তরে আরো চার বছর কি ছ'বছর।"

রঙ্গন অত জানত না। জানলেও বুঝত না। কখনো ভেবে দেখেনি। তার একমাত্র ভাবনা তার রূপ তাজা থাকবে না শুকিয়ে যাবে ? মা হলে কি সে এমন তন্বী থাকবে না তার ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে ? পরী তাকে যে বর দিয়েছে সে বরের দৌলতেই না সে এ বর পেয়েছে। যদি রূপহীনা হয় তা হলে পতির প্রেমহীনা হতে কত ক্ষণ ? পতির প্রেম চলে গেলে এ জীবনে আর কী থাকে ? কী নিয়ে বাঁচবে ?

তা বলে কি সে কোনো দিন মা হবে না? কোনো দিন না?

হবে না, এমন ধনুর্ভঙ্গ পণও সে করেনি। করার উপলক্ষ ঘটেনি। স্রেফ গড়িমসি করছে। মাতৃত্বকে বছরের পর বছর পেছিয়ে দিয়েছে। মাত্র পঁচিশ বছর তার বয়স। আরো দশ বছর অপেক্ষা করলে কী এমন ক্ষতি! ততদিন তো স্বামীর ভালোবাসা নিশ্চিত রূপে পাবে। তারপরে ও ভদ্রলোকেরও অপর প্রেমের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

মনটাকে তৈরি করতে সময় লাগে। বিশেষ করে এত বড় গুরুতর একটা পদক্ষেপের পূর্বে। অন্য কেউ হলে সেই রাত্রেই মনঃস্থির করে ফেলত। কিন্তু রঙ্গনের অতীত জীবন রূপহীনতার জ্বালায় জর্জর। আর তার দিদির নজির তো তার চোখের সুমুখে বর্তমান। দেখেছে তো কাঞ্চনের মতো পরীকে মাতৃত্বের পাকচক্রে পড়ে রূপরিক্তা হতে, পতিপরিত্যক্তা হতে। ডানাকাটা পরীর সমস্যা যদি অত কঠিন হয়ে থাকে তবে ডানাওয়ালা পরীর সমস্যা কি আরো কঠিন নয়? তার গতিবিধি বন্ধ হয়ে যাবে না? সে কি পারবে বাইরে কোথাও বেরোতে? শিশু তাকে বাড়ীতে কয়েদ করে রাখবে না? শিশুর বাপ কিন্তু ওদিকে অবাধে ফুর্তি করে বেড়াবেন। আমুদে মানুষ। আমোদ করা তাঁর চাইই। আমোদ করতে করতে প্রমোদ। প্রমোদ করতে করতে প্রমাদ।

অবশেষে একদিন মহিলামহলে কানাঘুষা চলল যে রঙ্গন ধরা পড়েছে। কেউ বললেন, প্রকৃতির সঙ্গে জারিজুরি খাটে

না। রেখে দাও তোমার পদ্ধতি প্রক্রিয়া। কেউ বললেন, এই বার ওর পায়ে বেড়ী পড়ল। উড়নচণ্ডী এখন ঘরে অন্তরীণ। কেউ বললেন, আহা! বেচারির অমন রূপ এর পরে ছায়া হয়ে যাবে।

রঙ্গনের বান্ধবীরা তার সঙ্গে দেখা করে রসিকতা করলেন —"এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। এই যেমন মোটর য়্যাক-সিডেণ্ট। তুমি চেয়েছিলে প্লেজার ট্রিপ। হয়ে গেল ল্যাণ্ড স্লিপ!"

এটা কিন্তু সত্য নয়। রঙ্গন চেয়েছিল স্বামীকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সন্তান দিতে। সে তাঁকে বাজিয়ে দেখেছিল যে তিনি গত ছ'বছর কাল এই দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। তবু মুখ ফুটে জানাবেন না, পাছে রঙ্গন তার স্বাধীন ইচ্ছায় না হয়ে অনিচ্ছায় মা হয়।

সেকালে নাকি খোকারা আকাশ থেকে নেমে আসত। একালে কেন তা হয় না! তা হলে তো মা'দের অশেষ কষ্ট বাঁচত। রূপ নষ্ট হতো না। রূপ চলে গেলে যা হয়, স্বামীর প্রেম চলে যেত না। রঙ্গন বুঝতে পারে না কেন তাকে দশ মাস অসুস্থ হতে হবে। কেন তার প্রাণ বিপন্ন হবে। বিধাতার এটা কোন দেশী বিচার। খোকা খোকা বলে ডাক দিলুম আর অমনি আকাশ থেকে খোকা নেমে এলো আমার কোলে। কী মজা! তা নয় অসহ্য দুর্ভোগ আর অসীম দুর্ভাবনা একটি শিশুর জন্যে।

যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। খোকা নয়, খুকু।

ক্ষৌণীশ তো কোলে তুলে নিয়ে নাচতে চাইলেন। নার্স তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মা'র কাছে দিল। মা তখন ভাবছে শিশুর জন্যে নয়, নিজের জন্যে। রূপ তার পাত্রান্তরিত হয়েছে। অবশিষ্ট যা আছে তা গর্ব করবার মতো নয়। মিলিয়ে দেখলে ক্ষৌণীশ যেমনকে তেমন, রঙ্গন যেমনকে তেমন নয়। পরী থেকে বানরীর বিবর্তনমার্গে এক কদম এগিয়ে।

৫

পুরুষ যেমনকে তেমন। নারী যেমনকে তেমন নয়। এক যাত্রায় পৃথক ফল। কী অন্যায়! কি অবিচার! ভগবানের রাজত্বে এমন অধর্ম! তা হলে ভগবানকে ডেকে কী হবে! তিনি পুরুষের দিকেই ঢলবেন।

রঙ্গন আবার পরীকে ডাকতে আরম্ভ করল। সেই দয়াময়ী পরীকে তার রূপদা সুখদা বরদা প্রেমদা পরীকে। পরীর জন্যই তো সব।

রঙ্গন এক মনে ডাকতে থাকল পরীকে। আকুল হয়ে। ব্যাকুল হয়ে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। অবশেষে পরীর আসন টলল। পরী আবার দেখা দিল। স্বপ্নে।

পরী বলল, "রঙ্গন, কী হয়েছে, বাছা ?"

রঙ্গন বলল, "পরী, আমার বড় দুঃখ। রূপ চলে যাবে বলে আমি মা হতে চাইনি। কী করি, স্বামীর মনে আফসোস। ওঁকে সুখী করতে গিয়ে আমার সর্বস্ব যেতে বসেছে। আমার রূপই তো আমার সর্বস্ব। আমার রূপ না থাকলে আমি কী!

ডানাকাটা বানরী! হায়, হায়! আমার কপালে শেষ কালে এই ছিল। বরং সুন্দরী না হওয়া ভালো, তবু একবার সুন্দরী হয়ে তার পরে অসুন্দর হওয়া ভালো নয়। এখন যে দুনিয়া হাসবে। পরী, তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করে, কিন্তু না বললে কি তুমি বুঝবে? আমার তলপেট এত দিনেও সমান হলো না। একটুখানি ফুলে রয়েছে। ওই একটুখানির জন্যেই আমার ফিগার মাটি হলো। কী দিয়ে ঢাকা দিই, বল তো? বিজ্ঞান এখানে নিরুপায়। তারপর আমার বুক এখন বিশাল আর ভারী আর ক্ষীর দিয়ে ভরা। শিশুর ভাগ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু জননীর দুর্ভাগ্য। আমি তো ভয়ে মাই দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। দিলে বেশ আরাম, কিন্তু টেনে টেনে শেপ নষ্ট করে দেবে। যা দুরন্ত মেয়ে! পরী, আমার মেয়েকে আমি খুবই ভালোবাসি। তার জন্যে না পারি এমন কাজ নেই। কিন্তু সে কি তা বলে আমার সর্বনাশ করবে? পিসী বলছে, ইহাই নিয়ম। আমি বলছি, এই যদি নিয়ম হয় তবে বাপ কেন এ নিয়মের আমলে আসে না? বাপ তো যেমনকে তেমন। এ লোকটি সত্যি বড় ভালো। পত্নীগত প্রাণ। কিন্তু পড়বে তো দু'বছর পরে কোনো ডাকিনীর পাল্লায়! অমন আমি ঢের দেখেছি! বৌয়ের যতদিন মৌ থাকে ততদিন বৌ বৌ বৌ। মৌ ফুরোলে দৌড়। পিসী বলছে, এর কোনো পেরতিকার নেই। আমি বলছি, প্রতিকার থাকতে বাধ্য। পরী, সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

পরী বলল, "প্রকৃতির নিয়ম উলটে দিতে পারি সে ক্ষমতা

কি আমার আছে ? আমি প্রকৃতির আনুকূল্য করতে পারি, প্রতিকূলতা করতে পারিনে। তোমার স্বামীকে তুমি প্রেম দিয়ে জয় কর। তা হলে তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না। রঙ্গন, তোমার কন্যাকেও তুমি স্নেহ দিয়ে জয় করবে। এই তার সুযোগ।”

রঙ্গন রাগ করে বলল, “পরী, তুমি ইচ্ছা করলে সব পার। তবু করবে না! আমার যে কী দুঃখ তোমাকে বলা বৃথা। তুমি তো মানুষ নও। তোমার হৃদয় নেই।”

পরী হেসে বলল, “আচ্ছা গো আচ্ছা। তোমার কী চাই এক কথায় বল দেখি।”

রঙ্গন বলল, “যেমনকে তেমন। আমি চাই যেমনকে তেমন হতে। যেমনকে তেমন থাকতে। মা হয়েও যেমনকে তেমন। তেমনি সুন্দরী, তেমনি সুমধ্যমা, তেমনি সুবক্ষা।”

পরী বলল, “কিন্তু এর একটা বিপদ আছে। তোমাকে সতর্ক করে দিই। এ জগতে জীবন্ত বলতে যা কিছু আছে তার বিকাশ আছে, বিকাশ নেই যার সে সজীব নয়। তোমাদের বাড়ীতে যে ছবি আছে সে ছবি চিরদিন একই রকম থাকবে। কারণ সে নির্জীব। তুমিও কি তোমার স্বামীর গৃহে ছবির মতো শোভা পেতে চাও। তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা ? রঙ্গন, কে তোমাকে ভালবাসবে ? কোন জীবনময় পুরুষ ?”

রঙ্গন বলল, “সে ঝুঁকি আমার। তুমি তো আমাকে যেমনকে তেমন করে দাও।”

পরী বলল, "তথাস্তু।" এই বলে মিলিয়ে গেল।

ঘুম থেকে জেগে রঙ্গন যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল তখন তার মুখে হাসি ধরে না। সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। পরীর দয়া হলে কী না সম্ভব!

তখন সে পিসীর কাছে খুকুকে দিয়ে আগের মতো আবার বাইরে যেতে শুরু করল। সবাই দেখে অবাক। মা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো ছাপ নেই তার চেহারায়, তার গড়নে, তার চলনে। রঙ্গন তো রঙ্গন। যেমনকে তেমন। তাকে নিয়ে একটা লেজেণ্ড সৃষ্টি হলো। একটা কিংবদন্তী। সে কিন্তু কাউকে বলল না তার কী কৌশল বা রহস্য।

মেয়েটাকে মাই দেবে না। ফীডিং বটল ধরিয়ে দেবে। কাছে রাখবে না। পিসীর কোলে দেবে। রাত্রে নিজের ঘরে শোয়াবে না। পিসীর ঘরে শোয়াবে। কাঁদলে জাগবে না। অঘোরে ঘুমোবে। যেন এ মেয়ে তার নয়। তার পিসীর।

ক্ষৌণীশের মনে খটকা বাধল। এ কী রকম মা! এ কী রকম নারী! যে রূপ তাঁকে একদা মুগ্ধ করেছিল সেই রূপই তাঁকে এখন প্রশ্নে প্রশ্নে কণ্টকিত করল। এমন রূপ কি একটা আশীর্বাদ না একটা অভিশাপ!

এ নিয়ে একদিন দিলখোলা কথাবার্তা হয়ে গেল। রঙ্গন বলল, "আমার রূপ গেলে আমার দশা হবে আমার দিদির মতো। সেটা কি ভালো? না এটা ভালো?"

ক্ষৌণীশ বললেন, "আমি কি রমেশের মতো কুপুরুষ?"

রঙ্গন বলল, "কুপুরুষ নও। কিন্তু পুরুষ তো। কোন দিন কাকে দেখে ভুলবে! আমি কি সে রকম ঝুঁকি নিতে পারি?"

এ তর্কের অন্ত নেই। বার বার তর্কের অবতারণায় কোনো পক্ষের উৎসাহ ছিল না। রঙ্গন বহির্মুখী হলো। আর ক্ষৌণীশ ঘরমুখো। এত যে বাইরে যেতে ভালোবাসতেন, না গেলে হাঁপিয়ে উঠতেন, তার চিহ্ন রইল না। আপিস থেকে সকাল-সকাল বাড়ী আসেন আর মেয়েকে নিয়ে পড়ে থাকেন। একশো বার তার কৌপীন বদলে দেন নিজের হাতে। রাত্রে মেয়েকে নিয়ে শুতে যান। তাঁর খাটের পাশে মেয়ের ক্ষুদে খাটটি। সকালেও মেয়ে আর মেয়ে আর মেয়ে। বেলা না হলে আপিসে যাবার নাম নেই।

মেয়ের কান্নায় ঘুম মাটি হয় বলে রঙ্গন অন্য ঘরে শোয়। রাত জাগলে তার চোখের কোলে কালি পড়বে, চোখের পাতা ফুলবে। পাউডার মেখে তা ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া শরীর তো একটা কল। কল বিগড়ে গেলে রূপ এলিয়ে পড়বে। রঙ্গন সে রকম ঝুঁকি নেবে না। মেয়ের জন্য সে বড় কম ভোগেনি। দারুণ যন্ত্রণা পেয়েছে। বাপ একটু ভুগলই বা। দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে সাম্য আসবে।

মেয়েকে চোখে চোখে রাখবেন বলে ক্ষৌণীশ সকাল-সকাল পেনসন নিলেন। যা দুর্দান্ত মেয়ে। কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে গাড়ীচাপা পড়বে। রঙ্গন তো আয়া রাখবে না। পিসীর কি রাস্তায় যাওয়া ভালো দেখাবে!

পেনসন যখন হলো তখন আর পুনরায় বসে থাকা কেন? ক্ষৌণীশ কলকাতার বাড়ী কিনলেন। গড়িয়াহাট অঞ্চলে। সেখানে তাঁর প্রধান কাজ হলো মেয়ের ঠেলাগাড়ী ঠেলে লেকের চার ধারে বেড়ানো। অনেকটা আইসক্রীমওয়ালার মতো। যে দেখে সেই কোলে নিতে চায়। এমন পরীর মতো মেয়ে। কোন দিন কে চুরি করে সেই ভয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করেন না।

মেয়ের মা কিন্তু নিরুদ্বেগে আপিস করে। হাঁ, আপিস। স্বামীর পেনসনে কুলোবে কেন? দায়ে পড়ে একটা চাকরি জোটাতে হয়েছে। সিভিল সাপ্লাই বিভাগ থাকতে চাকরির ভাবনা কী! রঙ্গন দশটা পাঁচটা আপিস করে, তার পরে সামাজিকতা করে। তার মনে পরম শান্তি। স্বামীকে সে খাঁচায় পূরেছে। উড়োপাখী আর উড়বে না।

কিন্তু দু'জনে দু'জনের কাছে অচেনা অজানা প্রতিবেশীর মতো। তার বেশী নয়। শিষ্টাচার ও সদ্‌ব্যবহার পদে পদে। দয়ামায়া প্রচুর। এর নাম যদি ভালোবাসা হয় তো ভালো-বাসার অকুলান নেই। পরী যে সতর্ক করে দিয়েছিল সে কি তবে খামোকা? রঙ্গন কি ছবি নয়? ক্ষৌণীশ কি জীবনময়? কে জানে! কে জানে!

(১৯৫৬)

খোকার নাম উদয়ন শুনে আমি মনে মনে হাসলুম। সংস্কৃত সাহিত্য উদয়ন কথায় ভরপুর। এই বার বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের পালা আসছে।

কিন্তু এই খোকা উদয়ন কবে যুবা উদয়ন হবে আমি তত দিন বাঁচলে হয়! বাংলা দেশের ভাস হওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

তা হলেও আমি স্থির থাকতে পারছিনে। আমারও একটি কথা জানা ছিল। সেটি এত কাল জানানো হয়নি। সব কি এখন মনে আছে? কেটে গেছে সতেরো আঠারো বছর। যতটুকু মনে আছে ততটুকু লিখে না রাখলে পরে হয়তো সেটুকুও মনে থাকবে না। তা হলে কি উদয়ন কথা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে?

না, না। সেটা ঠিক হবে না। যতদিন না খোকা উদয়ন যুবা উদয়ন হয়েছে ও বাংলাদেশে ভাস জন্মেছেন ততদিন আমার এই উদয়ন কথারও ছোট একটুখানি স্থান থাকতে পারে। অতএব বলা যাক।

যাঁকে নিয়ে এই কাহিনী তাঁর নামও উদয়ন। উদয়ন খান্। প্রাচীন জমিদার বংশ। ইদানীং এঁরা এই মুঘল পদবীর জন্যে লজ্জিত। ত্যাগ করতেও কুণ্ঠা, তা হলে

বনেদিয়ানা থাকে না। সেইজন্যে এঁদের কেউ কেউ নামের পূর্বে "পণ্ডিত" উপাধি ব্যবহার করছেন। উদয়ন কিন্তু তাতেও নারাজ। তিনি আজকের দিনেও "মিস্টার" শুনতে ভালোবাসেন। কেউ যদি "মিস্টার" না বলে "শ্রী" বলে তিনি মর্মাহত হন।

উদয়ন খান্ যখন অক্স্‌ফোর্ডে পড়তেন তখন সেখানে বেড়াতে গিয়ে কবিগুরু তাঁকে পরামর্শ দেন বাঙালীর সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা কইতে। অন্তত বাংলাদেশের কবির সঙ্গে। সেটা নোবেল প্রাইজ পাবার পূর্বাহ্ণে। লোকটিকে তিনি অত বড় ভাবতে পারেননি। তাই পাল্টা পরামর্শ দিয়েছিলেন, রোমে যখন থাকবেন তখন রোমানরা যা করে তাই করবেন। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর গুরুদেবের প্রতি তাঁর ভক্তি জন্মায়। তিনি তাঁর উপদেশ নিয়ে বাংলায় লিখতে আরম্ভ করলেন। ভ্রমণকাহিনী।

দেশে ফিরে এসে দেখলেন লিখে কিছু হয় না। গড়াতে গড়াতে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন কলকাতাস্থিত এক বিদেশী ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। সেখানে পেয়ে গেলেন মনের মতো কাজ। যে যখন আসত দেশবিদেশের খোঁজখবর নিতে তিনি তার সঙ্গে কল্পনায় বিশ্বপরিক্রমা করে আসতেন। খাসা লাগত প্রোগ্রাম তৈরি করে দিতে। যেন ওটা তাঁর নিজের জন্যে তৈরি। বেডেকার তাঁর মুখস্থ ছিল। ব্র্যাডশ ছিল জিহ্বাগ্রে। কী যে ভালো লাগত কন্টিনেন্টাল টাইমটেবল খুলে বসতে। প্যারিস থেকে কোন কোন ইন্টারন্যাশনাল এক্স্‌প্রেস কোন

কোন রাস্তায় যায়, কোন কোন দেশ অতিক্রম করে, কখন ছাড়ে, কখন পৌঁছয়, কোনটাতে ক'টা ক্লাস, স্লীপিং কার আছে কি না, আহারের কী ব্যবস্থা, এসব তাঁর নখদর্পণে। তাঁর মতো কেউ অত ঘোরেনি। তাঁর অপিসের ইংরেজ কর্মচারীরাও না। ও বেটারা ইংলণ্ডের বাইরে পাত্তা পায় না তো ঘুরবে কোথায়! এক ওদের সাম্রাজ্যের ভিতরে ছাড়া। অমন দ্বৈপায়ন জাত কি দ্বিতীয় আছে!

সেই সূত্রে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ হতে হতে হোটেলে রেস্টোরাণ্টে খাওয়া। আড্ডা জমতে জমতে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাওয়া। তখনকার দিনে তিনি ছিলেন সিন্ধবাদ নাবিকের আধুনিক বঙ্গীয় সংস্করণ। দশ বারো বছর ধরে বিশ্বপরিক্রমা আর কেই বা করেছিল! তাও যুদ্ধের সময়, বিপ্লবের সময়। তাঁর কাছে যে রসদ ছিল তাতে একাধিক সহস্র রজনী অক্লেশে কাবার হয়। সেইজন্যে একবার কোনো বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন থাকলে ডিনার না খেয়ে উদ্ধার ছিল না। কখনো কখনো সাপারও খেতে হতো। পার্ক স্ট্রীটের ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা একটা।

এর একটু সূক্ষ্ম রহস্য ছিল। যে জীবন পিছনে ফেলে এসেছিলেন, যাকে আর মাথা খুঁড়ে মরলেও ফিরে পাবেন না, সে জীবনের গল্প বলেও সুখ। বলতে বলতে মনে হতো যেন নতুন করে বাঁচছেন। পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে কখনো চলে যেতেন রাশিয়া, কখনো জাপান, কখনো আমেরিকা,

কখনো জার্মানী বা ফ্রান্স। ফেলে আসা মুখগুলিকে নতুন করে দেখতেন। অগণ্য বন্ধু। অসংখ্য বান্ধবী। স্মৃতিতে তাঁর জ্বলজ্বল করছিল তখনো। বর্ণনার দ্বারা তিনি তাঁদের সঙ্গলাভ করতেন। তাঁদেরই একজন হয়ে যেতেন। আবার কি কোনো দিন তাঁদের দেখা পাবেন ? কে জানে !

ঝুলি তাঁর অফুরন্ত নয়। অনিবার্যরূপে ফুরিয়ে এলো। বছর দুই পরে দেখলেন আগের মতো তাঁর তেমন সমাদর নেই। ইতিমধ্যে আরো অনেক সিন্ধবাদ এসে জুটেছে। হুজুকে বাঙালী তাদেরই মাথায় করে নাচছে। কিন্তু কয়েকটি বাড়ীতে তাঁর আসন একেবারে পাকা। প্রতি মাসেই ওঁরা তাঁকে ডাকবেন, তিনি ডাকলে সাড়া দেবেন। এটা হলো অহেতুক ভালোবাসা। খাওয়া, বসা, আড্ডা দেওয়া, একসঙ্গে কোথাও বেরোনো, একটা কিছু উপহার কিনে দেওয়া। একেই বলে বন্ধুতার টান। সিন্ধবাদ ফুরন্ত। বন্ধু অফুরন্ত।

এ সব বন্ধুতার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রয়োজনও যোগ দিত। তাঁর নয়, অপর পক্ষের। তার মধ্যে একটা ছিল তাঁর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করার নিষ্ফল প্রয়াস। একদিন না একদিন তাঁকে খোলাখুলি বলতে হতোই, বিয়ে আমার জন্যে নয়। আমি বিয়ের জন্যে নয়। আবার একটা মহাযুদ্ধ বা বিপ্লব বাধলেই তিনি তার আগে আঁচ পেয়ে জাহাজে উঠে বসবেন। কারো কোনো কথা শুনবেন না। কেন তা হলে বিয়ে করে একটি মেয়েকে কষ্ট দেওয়া ? তিনি হালকা বেড়ানোই পছন্দ করেন। একটা স্যুটকেস হলেই যথেষ্ট। স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ?

নৈব নৈব চ। শাস্ত্রে বলেছে পথি নারী বিবর্জিতা। শাস্ত্র যদিও মানেন না ওইটুকু মানেন।

গার্ডেন রীচে কাজ করতেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের এক পদস্থ কর্মচারী। পর্জন্য অধিকারী। তাঁর সঙ্গে উদয়নের আলাপ হয়েছিল প্যারিসে। তাঁর স্ত্রী বিপাশার সঙ্গেও। আলাপটা দেশে ফিরে ঝালিয়ে নেওয়া হয়। প্রায়ই তাঁদের ওখানে তাঁর ডাক পড়ত। আর কোনো উপলক্ষ না থাকলে ব্রিজের টেবলে চতুর্থ স্থান পূরণ করতে। তৃতীয় স্থান পর্জন্যের দূর সম্পর্কীয়া বোন কমলিনীর। উদয়নের তলে তলে সন্দেহ ছিল যে ওটা বোধ হয় তাঁকে বঁড়শিতে গাঁথবার টোপ। তিনি যত দূর জানতেন মেয়েটি অবিবাহিতা। বিয়ের বয়স বহু দিন পেরিয়ে গেছে। তাঁরই মতো বছর পঁয়ত্রিশ বয়সী। তা ব্রাহ্মসমাজে ও রকম হয়। তবে কোনো সমাজেই ওর মতো সুশ্রী মেয়ে অত দিন পড়ে থাকে না। একটা হিল্লে হয়ে যায়।

কিছুকাল পরে দেখেন কমলিনী নেই। ব্রিজ খেলাও হচ্ছে না। পর্জন্যদা বললেন, "ওহে উদয়ন, একটা উপকার করবে? তোমার বৌদি এম্পায়ারে যেতে চান। আমি তো পারছিনে নিয়ে যেতে। আমার একটু জরুরি কাজ আছে।"

কী একটা শো ছিল। বিপাশা যাবার জন্যে ছটফট করছিলেন। টিকিট আগে থেকে কেনা হয়েছিল দু'জনের দু'খানা। শেষ মুহূর্তে পর্জন্যদার জরুরি কাজ। অগত্যা উদয়নকেই যেতে হলো পার্শ্বরক্ষী হয়ে। ফিরপো তখন নতুন

খুলেছে। তাঁরা ফেরবার মুখে সেখানে খেয়ে এলেন। সেখানকার খরচটা উদয়নের।

এই রকম আরো কয়েক বার ঘটল। পর্জন্যদার একটা না একটা জরুরি কাজ। তিনি সাথী হতে পারেন না। উদয়নকেই যেতে হয়। এটা যেন একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়াল যে পর্জন্য যেতে না পারলে উদয়নকে যেতে হবে। বিপাশা সোজাসুজি টেলিফোনে জানাতেন, "আজও শুনছি ওঁর জরুরি কাজ। কে আমার সঙ্গে যাবে, উদয়ন? তুমি কি অত দয়ালু হবে যে আমাকে এখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?"

কোনো দিন সিনেমা, কোনো দিন থিয়েটার, কোনো দিন ক্লাব। বিপাশা সাধারণত কোনো শো হাতছাড়া করেন না। থাকেন তিনি হেস্টিংসে। সেখান থেকে অন্য কোনো সাথী সংগ্রহ করা সহজ নয়। টেলিফোন করে দূর থেকে একজনকে না একজনকে অনুরোধ করতে হয়। কেউ শোনে। কেউ শোনে না। কাজ কী অত অনিশ্চয়তায়? উদয়ন তো নিশ্চিত।

মাস কয়েক পরে বিপাশা একদিন উদয়নের কানে কানে বললেন, "কমলীকে তোমার মনে আছে? ওই দেখ, কমলীকে নিয়ে উনি ড্রাইভ করে বেড়াচ্ছেন। এতদিন পরে আমি জানতে পেরেছি ওঁর জরুরি কাজটা কী। কোনখানে ওঁর এনগেজমেণ্ট। চললেন ওঁরা ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল। আমরা যতক্ষণ সিনেমায় থাকব ওঁরা ততক্ষণ ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল উদ্যানে থাকবেন। তারপর ওকে শ্যামবাজারে দিয়ে উনি বাড়ী ফিরবেন।"

উদয়ন তো শুনে থ। তাঁর ধারণা ছিল এঁদের মতো সুখী দম্পতী আর নেই। পর্জন্যদার বয়স বছর চল্লিশ হবে। বিপাশাদির বছর পঁয়ত্রিশ। অত বয়সে নতুন কোনো রোমান্স প্রত্যাশা করা যায় না। তা ছাড়া অমন অশোভন ভাবে।

"কমলাকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে না দিলে বাড়ীতেই একটা কেলেঙ্কারি ঘটে যেত। বোন বলে থাকতে দিয়েছিলুম, জানতুম না যে সম্পর্কটা আরো মধুর। এখন ওঁকে থামাই কী করে? পুরুষমানুষকে তো পর্দায় পুরে রাখা যায় না। কিন্তু কমলীরা তো হিন্দু। ওরা পর্দা মানে না কেন? শ্যামবাজারে ওদের বাড়ী। সেখানে তো কড়া পর্দা।"

"তা হলে তাঁর এত দিন বিয়ে হয়নি কেন?"

"কে বলল হয়নি? এই তো বছর দুই আগে ও বিধবা হয়। এন্‌তার টাকা। মাথার উপর কেউ নেই। নিজেই নিজের অভিভাবক। সেইজন্যে ও অমন।"

উদয়ন বিস্মিত হলেন। এ কথাও ঠিক যে কেউ তাঁকে বলেনি কমলিনী অবিবাহিতা। কেউ তাঁর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধও করেনি। ওটা তাঁর অনুমান।

একদিন তাঁর সামনেই স্বামীস্ত্রীতে একচোট বচসা হয়ে গেল। পর্জন্যদা তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "উদয়ন, এর একটা নিষ্পত্তি চাই। আমি যেমন কমলীকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি তেমনি বিপাশাও তো তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। তা হলে ওর এত আক্রোশ কেন? ও কেন ধরে নিচ্ছে কমলী মেয়েটা ভালো নয়? আমি তো ধরে নিচ্ছিনে

উদয়ন লোকটা মন্দ। তুমি আমি বিপাশা তিনজনেই পশ্চিমে থেকেছি। আমাদের মধ্যে এ সংকীর্ণতা কেন? হিন্দুর ঘরের বিধবা বলে কি কমলী বেচারি নিজের দেশটাও চোখ মেলে দেখবে না? কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় খেলার ময়দান, কোথায় ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, কোথায় জাহাজের ডক, কোথায় বটানিক গার্ডনস কে তাকে এসব দেখাবে?"

উদয়ন কয়েক বার ঢোক গিলে বলতে চেষ্টা করলেন যে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল দর্শনের উপযুক্ত ক্ষণ রাতের বেলা নয়। কিন্তু তা হলে পর্জন্যদার পাল্টা যুক্তি হতো হয়তো এই যে, বিপাশা আর উদয়নও তো দিনের বেলা সিনেমায় যায় না।

এর পর উদয়ন বিপাশাকে এড়াতে শুরু করলেন। টেলি-ফোন করলে বলেন, "আজ আমারও তো একটা এনগেজমেণ্ট ছিল, বৌদি।"

একদিন দেখেন তাঁর অন্ধকার ফ্ল্যাট আলো হয়ে গেছে। সম্মুখে স্বয়ং বিপাশা দেবী। উদয়নকে তিনি অবাক করে দিয়ে বললেন, "তুমি যখন আমার ওখানে যাবে না তখন আমাকেই তোমার এখানে আসতে হয়। কিন্তু, উয়দন, আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ইচ্ছা করে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু তাতে ওদেরই সুবিধে। ভাইবোনে মিলে মনের সুখে ঘর করবে। প্রকাশ্যে। চাকরবাকরের সামনে। আমি যখন ফিরে আসব তখন দেখব সকলে হাসাহাসি করছে।"

কথাবার্তায় বোঝা গেল ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। কমলীকে নিয়েই ঝগড়াঝাটি। পর্জন্যদা নাকি বলেছেন যে

বিপাশার তো উদয়ন রয়েছে। বিপাশার জীবন তো শূন্য নয়। আর কমলী বেচারির জীবনে কী আছে! অমন একটি দুঃখিনীকে একটু সঙ্গ দেওয়া এমন কী অন্যায়! এসব হলো ব্রাহ্ম শুচিবাই। পশ্চিমে ঘুরে এসেও পিউরিটানগিরি।

উদয়ন এর কী করতে পারেন। পর্জন্যদা তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। পদস্থ কর্মচারী। উদয়নের ভীষ্মোপদেশ তিনি শুনবেন কেন? আর উদয়নও তো ভীষ্ম নন।

বিপাশা বললেন, "আমারও দোষ আছে। আমিও ওঁকে শাসিয়ে দিয়েছি যে, তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়।"

তার মানে তিনি বেশ একটু রং ফলিয়ে বলেছেন যে বোনটির সঙ্গে দাদাটির যে সম্পর্ক দেবরটির সঙ্গে বৌদিদিটিরও সেই সম্পর্ক। তা শুনে তাঁর স্বামী তো রেগে আগুন। রাগ থেকে অনুমান করা যায় কমলীর সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কেমনতর।

উদয়ন ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি হৃদয় অন্বেষণ করে দেখলেন যে তিনি প্রেমে পড়েননি। আর বিপাশাও যে প্রেমে পড়েছেন তাও তো বিশ্বাস হয় না। তা সত্ত্বেও ঘটনার গতি যেদিকে যাচ্ছে সেটা লোকচক্ষে বিসদৃশ। প্রেমও হলো না, অথচ কলঙ্কও হলো, এ তো বড় রঙ্গ। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে।

ও রকম ভাবে একলা ফ্ল্যাটে কোনো মহিলার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যায় না বলে উদয়ন তাঁকে নিয়ে

রেস্টোরাণ্টে গেলেন। সেখানেও চেনা মানুষ আসে বলে সেখান থেকেও তাড়াতাড়ি উঠলেন। দিয়ে এলেন তাঁকে তাঁর বাড়ীতে। তিনি বসতে বললেন। উদয়ন বসলেন না।

এর পর থেকে বিপাশাই আসতে লাগলেন উদয়নের সন্ধানে। উদয়ন যত বার তাঁকে দেখেন তত বার লক্ষ করেন যে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমিক অবনতি হচ্ছে। তিনি কেমন যেন নার্ভাস। কলম দিয়ে কিছু লিখতে গেলে তাঁর হাত কাঁপে। কথা বলতে বলতে তাঁর মাথাও যে কাঁপে না তা নয়। এসব কিসের লক্ষণ ?

উদয়ন আবার পর্জন্যদার সঙ্গে আড়ালে মোকাবিলা করলেন। তাঁকে অভয় দিলেন যে উদয়ন ঠিক আছেন। তাঁর কাছ থেকে সেই মর্মে অভয় চাইলেন।

পর্জন্য বললেন, "তোমার বৌদির যদি ইচ্ছা হয় তিনি আমাকে ত্যাগ করতে পারেন, উদয়ন। আমাদের ভাঙা সম্পর্ক আর জোড়া লাগাবে না, জেনো। কমলীকে আমি সুখী করতে চাই। একটা বকাটে বোম্বেটের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল। সারা জীবনটা ও দুঃখ পেয়েছে। আমার সব চেয়ে প্রিয় বোন, ওর দুঃখে আমিও কম দুঃখ পাইনি। ছেলেবেলা থেকেই আমার উপর ওর একটু বেশী রকম টান। অন্যান্য সমাজে বারণ এ রকম ভাইবোনের বিয়ে বারণ নয়। আমাদের সমাজে বলে তার ও আমার কোনো আশা ছিল না। এখন তো দিনকাল বদলে গেছে। কেন তবে আমরা মনের মতো জীবন যাপন করব না ?"

উদয়ন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। বললেন, "কিন্তু বৌদির দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে। তিনি কী নিয়ে থাকবেন?"

"তিনিও আবার বিয়ে করতে পারেন। ছেলেপুলে যখন হয়নি তখন বিশেষ কোনো জটিলতাও নেই। বাধা দিলে আমিই দিতুম। আমি দিচ্ছিনে।" এই বলে তিনি উদয়নের মুখ বন্ধ করে দিলেন।

বিপাশাকে এ কথা জানাতে তিনি বললেন, "কিন্তু বিয়ে করতে পারি বললেই তো বিয়ে অমনি হয় না। কাকে বিয়ে করব? কে বিয়ে করবে আমাকে? আমি কি তবে নিঃসঙ্গ হব? এখনো যে দীর্ঘ পথ সামনে। সঙ্গীহীন জীবন কল্পনা করা যায় না। এমন হবে জানলে আর কাউকে বিয়ে করে থাকতুম। যখন রূপ ছিল, যৌবন ছিল, তখন তো প্রার্থীর অভাব ছিল না। এখন আমাকে প্রার্থনা করছে কে? না আমিই প্রার্থিনী হব?"

এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। উদয়ন নীরবে শুনে যেতে থাকলেন।

"উদয়ন, আমি কি খুবই খারাপ দেখতে? আমি কি সঙ্গিনী হিসাবে নিতান্ত অচল? আমার হাতের রান্না কি একেবারেই অখাদ্য? আমার সাজসজ্জা ও অঙ্গরাগ কি একটুও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় না? আমার গৃহরচনা কি সম্পূর্ণ শ্রীহীন? উদয়ন, আমি কি ভালোবাসতে জানিনে, পারিনে? আমি কি ভালোবাসার অযোগ্য? তবে কেন এমন হলো? কমলী আমার চেয়ে কিসে ভালো?"

বস্তুত বিপাশার যা আছে কমলীর তা নেই। বিপাশা কত দেশ দেখেছেন, কত লোকের সঙ্গে মিশেছেন। সুবসনা, সুভূষণা, সুভাষিণী সোসাইটি উওম্যান। রূপ এখনো অস্ত যায়নি। এখনো লোকে একবার দেখলে দু'বার চেয়ে দেখে। এখনো তন্বী, যত বয়স তার চেয়ে কম দেখায়।

অপর পক্ষে কমলীর যা আছে বিপাশার তা নেই। কমলীর আছে কমনীয় স্নিগ্ধ স্বভাব। স্বভাবের অনুরূপ আকৃতি। কমলী যেন ভিতর থেকে তৈরি। নম্র বিনীত ত্যাগময় প্রকৃতি তার। ভিতর থেকে বাইরে ফুটেছে। সে অশান্ত পুরুষকে দু'দণ্ড শান্তি দিতে পারে। তার কোলে মাথা রেখে যে শান্তি তার চেয়ে কাম্য আর কিছু নেই। সারা দিন খেটেখুটে আসে যে পুরুষ, সে দিনান্তে কী পেলে সুখী হয়? সাজসজ্জা নয়, অঙ্গরাগ নয়, ঝকঝকে ড্রইং রুম নয়, ঝলমলে পার্টি নয়, ত্রুটিহীন আদবকায়দা নয়, হিসাব-করা বাক্যালাপ নয়, সে চায় অন্ধকার আকাশের তলে কোনো অচঞ্চলা নারীর সুস্থির কোলটিতে মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে থাকতে। রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিতে।

বিপাশাকে উদয়ন বলতে পারল না যে, কে কার চেয়ে ভালো এ গণনা এখানে অবান্তর। এক দিক থেকে বিপাশা ভালো। এক দিক থেকে কমলী। দু'টি ভালোর থেকে একটি ভালো বেছে নিতে বললে কোন পুরুষ কোনটিকে বেছে নেবে তা নির্ভর কোন পুরুষ কিসের অভাব বোধ করছে তার উপর। পর্জন্য বোধ হয় অভ্যস্ত জীবনে সুখী নন, তিনি চান অন্য রকম

জীবনধারা। সেই অন্য রকম বিপাশার হাতে নেই যে তার জন্যে বিপাশার দিকে তাকাবেন। সম্ভবত কমলীর হাতে। তাই কমলীর প্রতি তাঁর উন্মুখ ভাব।

এখানে শ্রেয়ঃ হচ্ছে কিছু কালের জন্যে ছেড়ে যাওয়া ও ছেড়ে থাকা। বিপাশা কিন্তু ভাবতেই পারেন না যে আর-একটি মেয়ে উড়ে এসে তাঁর সাজানো ঘড় জুড়ে বসবে। তাঁর শয্যার শুভ্রতা মলিন করবে। তাঁর চাকরবাকরের উপর রানী হবে। তাঁর স্বামীর গায়ে হাত দেবে। না। কিছু কালের জন্যেও না। সেই যে একটি দিন সেই দিনই ছেদ। যুক্ত জীবনের জপমালা সেইখানে এসে ছিন্ন হলো।

কিন্তু দিন দিন তাঁর প্রত্যয় হচ্ছে যে পর্জন্যর প্রেম পুরাতন খাত ছেড়ে অন্য খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে। তাঁর সাধ্য নেই যে তাকে পূর্ব খাতে ফিরিয়ে আনেন। তিনি কি তবে চুপ করে সহ্য করে যাবেন? না। তাঁর সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাঁকেও তাঁর স্বতন্ত্র জীবনধারা অন্বেষণ করতে হবে। কে তাঁর সাথী হবে? উদয়ন হলে কেমন হয়? হলে কার কী ক্ষতি?

উদয়ন বলতে পারতেন, আমি না। আমি অনিকেত। আমি যে কখন কোথায় থাকব তা আমিও জানিনে। কেন তবে সাথী খুঁজি, সাথী হই? কিন্তু বলতে পারল না, মৌন থাকল। মৌন থাকল যে, তার থেকে বিপাশা টেনে নিলেন মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

তাঁর ভুল ভেঙে দেওয়া নিষ্ঠুরতা হতো। উদয়নের দয়ামায়া

ছিল। তিনি ভাবলেন দাম্পত্য কলহে বহ্বারম্ভ লঘুক্রিয়া। মিটে যাবে দু'দিন পরে।

২

মিটমাটের চেষ্টাও যে না হলো তা নয়। বন্ধুরা সকলেই এক এক বার হাত লাগিয়ে দেখলেন। কিন্তু পর্জন্য যে শর্তে মিটমাট করতে চান বিপাশা সে শর্তে রাজী নন।

পর্জন্যর কথা হলো, "কমলীর সঙ্গে সম্বন্ধ আমাকে রাখতেই হবে। এর দরুন যদি বিপাশার সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করতে হয় তবে তাও সই। ও যদি আমার সঙ্গে থাকতে চায় থাকতে পারে। কিন্তু মুরুব্বিয়ানা ফলাতে পারবে না। আমার উপরও না। কমলীর উপরও না। আমরা কী করি না করি তার জন্যে বিপাশার কাছে জবাবদিহি করতে প্রস্তুত নই। কমলীকে যে আমি বাড়ীতে আনিনে এই যথেষ্ট নয় কি?"

আবার বিপাশা যে শর্তে মিটমাট করতে চান পর্জন্য সে শর্তে রাজী নয়। বিপাশার কথা হলো, "কমলীর সঙ্গে সম্বন্ধ বরাবর ছিল। কোনো দিন কিছু বলিনি। কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে। ও আজ বিধবা হয়েছে বলে কি ওর আর কেউ নেই যে দাদাকেই সব কিছু হতে হবে? ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই চুকে যায়। বিধবার বিয়ে তো আজকাল নতুন কথা নয়। হিন্দুর ঘরের মেয়েদেরও প্রগতি হচ্ছে।"

কিছুতেই কিছু হলো না, ভিতরে ভিতরে ওদের ছাড়াছাড়ি

হয়ে গেল। যদিও বাইরের ঠাট বজায় রইল। তার পর যা হলো তা ট্র্যাজেডী না তামাশা?

এ বলে, "তুমি আমার নামে ডিভোর্সের মামলা কর।"

ও বলে, "তুমি আমার নামে ডিভোর্সের মামলা কর।"

এ বলে, "আমি যথেষ্ট কারণ দিয়েছি।"

ও বলে, "আমি যথেষ্ট কারণ দিয়েছি।"

এ বলে, "আর কত চাও?"

ও বলে, "আর কত চাও?"

সেই যে একটা জনশ্রুতি আছে। দুই পশ্চিমা ভদ্রলোক ট্রেন ধরতে গেছেন। ইনি বলেন, "আপ উঠিয়ে।" উনি বলেন, "আপ উঠিয়ে।" বলতে বলতে ট্রেন ছেড়ে দিল। কারো যাওয়া হলো না। এও অনেকটা তেমনি।

পর্জন্য মামলা করবেন না। কেননা কমলী সংস্কারবদ্ধ হিন্দু বিধবা। ধনবতী। পুনর্বিবাহ করলে পূর্ব পতির সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না। পর্জন্য তা হলে শুধু শুধু ডিভোর্স নিয়ে কী করবেন! বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁর কী এমন ক্ষতি!

বিপাশাও মামলা করবেন না। কেননা উদয়ন যদি তাঁকে বিয়ে না করেন তা হলে তাঁর এ কূল ও কূল দু'কূল গেল। বিয়ের প্রস্তাব তো উদয়নের দিক থেকে আসেনি। পুরুষ মানুষের দিক থেকেই আসা উচিত। একমাত্র ব্যতিক্রম ২৯শে ফেব্রুয়ারি। যে বছর লীপ ইয়ার। চার বছরে সেই একটিমাত্র দিন নারী বলতে পারে পুরুষকে, "তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। তেমনি কমলী কবে সংস্কারমুক্ত হবে তার জন্যে। সে যে নারায়ণশিলা সাক্ষী করে বোম্বেটের বধূ হয়েছিল তা তো একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেনি। মরে গেলেও কি ভুলতে পারবে! পরলোকে যখন বোম্বেটের সঙ্গে দেখা হবে তখন মুখ দেখাবে কী করে! বোম্বেটে যদিও চিরদিনই মুক্ত পুরুষ। শিলা তাঁর কাছে তুচ্ছ।

অপেক্ষা। অপেক্ষা। দু'জনেই অপেক্ষা করতে চান। পর্জন্য ও বিপাশা। একই বাড়ীতে থেকে একই টেবিলে বসে একই বিছানায় শুয়ে—তোম ভি মিলিটারি, হম ভি মিলিটারি। কেউ সিভিল নয়।

কিন্তু এমন করে বেশী দিন চলতে পারে না। যে অসতী নয়, অসতী হবেও না, সে যদি প্রকারান্তরে বলে যে সে অসতী তা হলে সেই সঙ্গে প্রত্যাশা করতে পারে না যে তার স্বামী উলটে সতী হবে। তা না বলে সে যদি বলত যে স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে অসতী হয়নি, হবে না, তা হলে বরং ভরসা থাকত যে সময়ে স্বামীর স্বভাব শোধরাবে।

নিজের চালে নিজেই চালমাৎ হলেন বিপাশা। পর্জন্য বললেন, "তুমি যখন সতী নও তখন এ বাড়ীতে তোমার থাকা উচিত নয়। নয়তো বল আমিই অন্যত্র থাকি।"

এ কথা শুনলে কার না মাথা খারাপ হয়! তখন থেকেই বিপাশার মাথা খারাপ হওয়া শুরু হলো। নার্ভ তো আগে থেকেই খারাপ ছিল।

উদয়ন কী করতে পারেন। গেলেন পর্জন্যর কাছে। হাতে

পায়ে ধরে বললেন, "দাদা, আমি তো কিছু করিনি। বৌদি অসতী হবেন কার সঙ্গে! ওঁকে তুমি বিশ্বাস কোরো। আমাকেও। তোমাকে না জানিয়ে কোনো দিন কিছু হবে না।"

পর্জন্য বললেন, "তোমাকে যদি অবিশ্বাস করতুম তোমার সঙ্গে ঘোরাফেরার অবাধ স্বাধীনতা দিতুম না, উদয়ন। আমি জানি তোমরা ঠিক আছো। তা হলেও আমাকে ওই চাল দিতে হয়। নইলে ও আমাকে ছাড়বে না। আর আমিই বা ওকে ছাড়িয়ে দিই কী করে? যে মেয়ে অসতী নয় তাকে জেনেশুনে ত্যাগ করতে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র হলে পারতুম হয়তো। এ যুগের পর্জন্যভূষণ আমি, এত বড় অন্যায় আমার দ্বারা তো হবে না। উদয়ন, এর একটা নিষ্পত্তি চাই। তুমিই বল আমার কর্তব্য কী।"

উদয়ন বললেন, "কমলিনী দেবীর সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখা।"

"হা হা। হীয়ার হীয়ার।" পর্জন্য হাত তালি দিলেন। "তুমি কবে থেকে পিউরিটান সাজলে হে! দশ বারো বছর পশ্চিমে কাটিয়ে, জাপানে কাটিয়ে, কী দেখলে? কী শিখলে? তোমার পূর্ব ইতিহাস আমার অজানা নয়। প্যারিসের ছেলেরা আমাকে বলেছিল তুমি একটি লেডী কিলার। রু দ্য সোমরার্দ মনে আছে? সেখানে কার সঙ্গে বাস করতে? অভিজাত শ্বেত রুশ মহিলা কাউন্টেস—কী যেন তাঁর নাম? টোকিওতেও তাই। বিপাশাকে ওসব জানতে দিইনি। শুধু বলেছি, উদয়নের অত ছোট নজর নয় যে সে তোমার শ্রেণীর মেয়ের প্রেমে পড়বে। দশটা বছর সবুর কর। আমাকে হতে

দাও সার পর্জন্য অধিকারী। নিজে হও লেডী অধিকারী। তার পরে দেখবে উদয়ন তোমার জন্যে উদ্বাহু। কেমন? ঠিক বলেছি কি না?"

উদয়নকে বাধ্য হয়ে কবুল করতে হলো যে, যা রটে তার কিছু কিছু বটে। তবে যতটা রটে ততটা ঘটে না। সে লেডী কিলার নয়। তবে সে মৃগয়া না করে মাংস খায় না। বরং নিরামিষাশী থাকবে, তবু কেনা মাংস খাবে না, চুরি করা মাংস খাবে না, এমন কি পাতে দেওয়া মাংসও খাবে না। মন্ত্র পড়া নিবেদিত মাংসেও তার অপ্রবৃত্তি। এর মধ্যে শ্রেণীর প্রশ্ন নেই। ওটা ভুল ধারণা।

"তার মানে তুমি সেকালের ক্ষত্রিয়?" পর্জন্যর চোখে প্রশংসা ও ঈর্ষা।

"তার মানে আমি চিরকালের ক্ষত্রিয়।" উদয়নের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়।

"কিন্তু এ কালের ভারতবর্ষে মৃগয়ার পরিসর কোথায়? বুঝতে পারছি তুমি বিশুদ্ধ নিরামিষভোজী।" পর্জন্য হেসে উঠলেন।

"অগত্যা।" উদয়ন নীরব হলেন।

একদিন স্বামীস্ত্রীতে খিটিমিটি বাধল চা খাওয়ার সময় চামচেটা কেমন করে ধরতে হয় তাই নিয়ে। চামচের হাতলের গোড়াটা দুই আঙুলের ডগা দিয়ে টিপে ধরলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, জানেন পর্জন্য, তবু শ্যামবাজারের লোকের মতো অসভ্যতা করবেন। দিন দিন তিনি শ্যামবাজারী হয়ে উঠছেন।

এতকালের শিক্ষা, এত সহবৎ, সব জলে পড়ল। তা শুনে পর্জন্য সেই যে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যান আর ওমুখো হন না। শ্যামবাজারে কমলীর ওখানে আশ্রয় নেন। ওইখান থেকেই গার্ডেন রীচে যাওয়া আসা করেন। গাড়ীটাও নিয়ে গেছেন। বিপাশা অসহায়। ভদ্রমহিলারা তখনকার দিনে ট্রামে বাসে উঠতেন না। আর ট্যাক্সিও সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। খরচও কম নয়।

উদয়নকেই যেতে হলো হেস্টিংস। ওঁকে ওঁর বাপের বাড়ী দিয়ে আসতে হলো বালীগঞ্জ অঞ্চলে। দিন কয়েক বাদে দেখা গেল ব্যাগ ও ব্যাগেজ হাতে নিয়ে কারা সব উদয়নের ফ্ল্যাটে ঢুকছে। পিছনে ও কে! বিপাশা? ওঁর কি মাথা খারাপ বলে এত দূর খারাপ! পার্ক স্ট্রীটের ম্যানসনের ব্যাচেলর ফ্ল্যাট। তাতে একজনেরই কুলোয় না। তাও যদি পুরুষমানুষ হতো! কোথায় আলাদা ড্রেসিং রুম? কোথায় আলাদা বাথ রুম? আলাদা শোবার ঘরই বা কোথায়? উদয়নকে বসবার ঘরে ক্যাম্প খাট পাততে হবে, সেটা না হয় সম্ভব, কিন্তু তার শোবার ঘর কি বিপাশার সহ্য হবে?

"এ কী, বৌদি!" উদয়নের মুখ দিয়ে কথা সরতে চায় না।

"দেখতেই তো পাচ্ছ আমি তোমার অতিথি। অনিমন্ত্রিত বলে কি অভ্যাগত?" বিপাশা তার অনুরোধের জন্যে অপেক্ষা না করে জমিয়ে বসলেন।

সেই যে তিনি এলেন তার পরে যাবার নাম করেন না।

উদয়ন পর্জন্যর সঙ্গে দেখা করলেন। পর্জন্য ইতিমধ্যে বাড়ী ফিরেছেন। একা নয়, জোড়ে।

"এখন আমার কর্তব্য কী ?" জানতে চাইলেন উদয়ন।

"তুমি তো ওকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পার না। তবে তুমি একটা কাজ করতে পার। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর দাদার কাছে দিয়ে আসতে পার।"

"দাদা রাজী হলেও তাঁর স্ত্রী নারাজ। ওঁরা বলেন ওঁদের ওখানে ঠাঁই হবে না। যার স্বামীর অত বড় বাড়ী সে কেন স্বামীর সঙ্গে থাকবে না ? এই হলো ওঁদের প্রশ্ন। প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর। আমি বলি কি, তুমি চল একবার দেখা করে আসবে।"

পর্জন্য বললেন, "জানো তো আমার শর্ত। ও কি সন্ধি করবে ?"

তা শুনে বিপাশা জ্বলে উঠলেন। নেভার। উদয়ন আর ও প্রসঙ্গ তুললেন না।

কয়েক রাত পরে বিপাশা তাঁকে শোবার ঘরে ডেকে বললেন, "তোমাকে আমি কষ্ট দিতে আসিনি। তোমার যেখানে শোওয়া অভ্যাস সেখানে এসে শোও। আমি আর কতটুকুন জায়গা জুড়ব !" এই বলে তিনি এক কোণে সঙ্কুচিত হয়ে শুলেন।

সত্যি বেচারি শীতের নদীস্রোতের মতো শীর্ণ কৃশ ক্ষীণকায় হয়েছিলেন। দেখলে মায়া হয়। উদয়ন তাঁর কাছে বসলেন। তাঁর ডান হাতখানি ধরলেন।

বিপাশা বললেন, "আজ কোন্ তারিখ মনে আছে ?"

উদয়ন বললেন, "তা থাকবে না ? আজ ২৯শে ফেব্রুয়ারি। এটা লীপ ইয়ার।"

তখন বিপাশা বললেন, "তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?"

উদয়নের মাথায় বাজ পড়ল। এ দিনে নারীকে প্রত্যাখ্যান করতে নেই। বুদ্ধিমানের মতো এড়িয়ে বেড়াতে হয়। না এড়ালে তো ধরা পড়লে।

উদয়ন বললেন, "আমি যে বিশ্বপথিক। তুমি কি আমার সঙ্গ রাখতে পারবে ?"

বিপাশা বললেন, "ছায়ার মতো।"

না। প্রত্যাখ্যান করা হয়ে উঠল না। উদয়ন গ্রহণ করলেন। পরের দিন লক্ষ করলেন শীতের নদী নয়, শরতের নদী। এক রাত্রেই এক গাছ শিউলি।

উদয়ন বলেছিলেন পর্জন্যকে জানাবেন। জানালেন তিনি ও বিপাশা মিলে এক কণ্ঠে।

পর্জন্য বললেন, "আচ্ছা, আমি সলিসিটরের বাড়ী যাচ্ছি। তোমরা পাপী। আমি পুণ্যবান। আমি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত, অসম্মানিত। আমার একেবারেই সায় নেই। খবরদার, তোমরা আমাদের ধরিয়ে দিয়ো না। দিলে তোমরাই ডিভোর্স পাবে না। এমন চমৎকার এ বিষয়ে আইন। গুড লাক, বিপাশা। গুড লাক, উদয়ন।"

এসব খবর ছাপা থাকে না। যা ঘটে তার চেয়েও রটে। উদয়ন শুনে মুগ্ধ হলেন যে হতভাগ্য পর্জন্যভূষণের সঙ্গে বন্ধু-

সম্পর্ক পাতিয়ে তাঁর সরলবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক কুখ্যাতিসম্পন্ন নারীহন্তা উদয়ন হতভাগিনী বিপাশাকে বিপথ-গামিনী করে বর্জনের ছল খুঁজছে। লোকের কথায় কান দেওয়া তাঁর দস্তুর নয়। ওর চেয়ে বিশ্রী কথাও শুনতে হয়েছে প্রবাসের ভারতীয় মহলে। চেঙ্গিজ খান্ ও উদয়ন খান্। এ বলে আমায় ছাখ ও বলে আমায় ছাখ।

কিন্তু বিপাশা বেচারি একেবারে এলিয়ে পড়লেন। একে তো তাঁর সমাজে মেলামেশা বন্ধ। কোথাও যেতে পারেন না। কারো বাড়ী। কোনো ক্লাবে, কোনো রেস্টোরাণ্টে বা সিনেমায়। সর্বত্র চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তার উপর পত্রযোগে বা টেলিফোনে অযাচিত সতর্কতাবাণী। উদয়ন সম্বন্ধে যত রকম কাহিনী। অমূলক। অলীক। অত্যুৎসাহিনীরা ফ্ল্যাট চড়াও হয়ে শুনিয়ে দিয়ে যান উদয়ন কার কার সর্বনাশ করেছে।

বিপাশার হাতে দেরাজের চাবী ক্যাবিনট্র্যাঙ্কের চাবী দিয়েছিলেন উদয়ন। তিনি যতক্ষণ আপিসে থাকেন বিপাশা ততক্ষণ এটা খোলেন, ওটা বন্ধ করেন, সেটা সাজিয়ে রাখেন। এমনি করে একদিন তাঁর নজরে পড়ে গেল একরাশ পুরোনো আলবাম। কবেকার সব ফোটো। বিভিন্ন দেশের। তার কোনো কোনোটা প্রণয়ীযুগলের। কোনো কোনোটা বিরহিণী প্রণয়িনীর। নিচে দু'ছত্র সরস উক্তি।

সেদিন আপিস থেকে ফিরে উদয়ন যেই তাঁকে একটু আদর করতে যাবেন অমনি তিনি ওঁর হাত সরিয়ে দিয়ে

ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, "ছুঁয়ো না। ছুঁয়ো না আমাকে। তুমি লেডী কিলার। প্রজাপতি মেরে পিন দিয়ে আঁটা তোমার রীতি। আমি লেটেস্ট, কিন্তু লাস্ট নই। আমাকে মেরে তুমি পিন দিয়ে আঁটবে। তার পর আরেকজনকে দেখাবে।"

তখনো উদয়নের হোঁশ হয়নি যে দেরাজ খোলা, ট্রাঙ্ক খোলা। আলবাম ওলটানো। যখন হোঁশ হলো তখন তিনি হাঁটু গেড়ে মাফ চাইলেন। অপেরার ভঙ্গীতে।

বিপাশা তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে একটা চোখা বাক্যবাণ ছুঁড়ে মারলেন। "পুরুষেরা দেখছি কেউ সতী নয়। কেন তবে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা!"

উদয়নের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। নিজের জন্যে নয়, বিপাশার জন্যে। তিনি যে প্রকৃতিস্থ নন তা তো স্পষ্ট। কেমন পাগলের মতো চাউনি। পাগলের মতো হাবভাব! যদি পাগল হয়ে যান তা হলে!

বিপাশা কখন এক সময় নিচে নেমে গিয়ে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে বসলেন। উদয়ন তেতালা থেকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর পিছু নিলেন। মোটরে স্টার্ট দিতে দিতে ট্যাক্সি উধাও। আন্দাজে হেস্টিংস অভিমুখে ছুটলেন। যা মনে করেছিলেন তাই। ঘরমুখো গোরু আর ঘরমুখো নারী। কেউ রুখতে পারে না।

তার পর লক্ষ করলেন ট্যাক্সি ও বাড়ীতে ঢুকল না, বাইরে দাঁড়িয়ে ভস্ ভস্ আওয়াজ করে আবার চলতে লাগল। কী ব্যাপার! উদয়ন চেয়ে দেখলেন ও বাড়ীর গেটের ও

ধারে কমলী। কানে এলো, "যেয়ো না। যেয়ো না। বৌঠান। বৌঠান।" উদয়নের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথায় কাপড় দিল কমলী।

উদয়ন দাঁড়ালেন না। ট্যাক্সিকে তাড়া করলেন। কিন্তু ধরতে পারলেন না। ট্যাক্সি লোয়ার সারকুলার রোড ধরে বরাবর চলল শেয়ালদা। স্টেশনের ভিড়ে বিপাশা কোথায় হারিয়ে গেলেন। মোটর পার্ক করতে গিয়ে উদয়ন দেরি করে ফেললেন। আরো দেরি হলো প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটতে। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে খোঁজ নিয়ে শুনতে গেলেন দু'খানা ট্রেন পর পর ছেড়ে দিয়েছে। একখানা বনগাঁর দিকে। একখানা চাটগাঁর দিকে।

যিনি কন্টিনেন্টের নাড়ীনক্ষত্র জানেন তিনি যে স্বদেশের সামান্যতম সন্ধান রাখেন না কে একথা বিশ্বাস করবে! বাঁশ বনে ডোম কানার মতো শেয়ালদা স্টেশনে তাঁর নাকাল অবস্থা। কোথায় চাটগাঁ, কোন্ পথ দিয়ে ট্রেন যায়, কোন্ কোন্ স্টেশন অতিক্রম করে? কোথায় বনগা? সেখানে যেতে হলে এর পর কোন্ ট্রেন ধরতে হবে? খোঁজ খবর নিতে নিতে রাত হয়ে গেল। সেদিন আর ধাওয়া করা হলো না। ওদিকে মোটরটার উপর মায়া ছিল। কেউ দেখবার নেই।

রেলওয়ে পুলিশে খবর দিলেন উদয়ন। টেলিফোন করলেন পর্জন্যকে, বিপাশার দাদাকে। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। কেউ মোটরে করে কেউ রেলে করে পরের দিন রওনা হয়ে গেলেন। ঘরের কথা তো খবরের কাগজে প্রকাশ করা যায় না। নয়তো

"বিপাশা, ফিরে এসো" বলে বলে একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দেওয়া যেত।

কয়েকদিন কোনো হদিস পাওয়া গেল না। পর্জন্য উদয়নের কাছে আসেন, উদয়ন পর্জন্যর কাছে যান, দু'জনে যান দাদার কাছে। বিপদের দিনে তাঁরা সকলে এক। প্রত্যেকে বলেন, "আমারি দোষ। আমারি ভুলে এ রকম হলো।" প্রত্যেকে অঙ্গীকার করেন, "ও যদি ফিরে আসে আমি ওকে ঘরে নেব।"

অদৃষ্টের পরিহাস। শেষে জানা গেল লালগোলার স্টীমারে তাঁকে পাগল অবস্থায় আবিষ্কার করে বহরমপুর পাগলা গারদে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ইচ্ছা করলে আত্মীয়েরা কেউ নিয়ে আসতে পারেন। কে যাবে? পর্জন্য রাজী নন পাগলের ভার নিতে। দাদাও রাজী নন। উদয়ন বললেন, "আমার তো ওইটুকু ফ্ল্যাট। ওখানে নিয়ে রাখলে ম্যানসনসুদ্ধ ভাড়াটে তেড়ে আসবে।"

বিপাশা রয়ে গেলেন পাগলা গারদে। প্রথম প্রথম তিন জনেই টাকা পাঠাতেন। তারপরে দাদা ক্ষান্তি দিলেন। তার পর স্বামী। তিনি তো আর স্বামী নন। পরে একদিন তাঁর বিয়ে হয়ে গেল কমলীর সঙ্গে। ইতিমধ্যে তিনি ডিভোর্সের মামলায় জিতেছিলেন। একতরফা ডিক্রী।

বিপাশাকে যাঁরা দেখতে যেতেন তাঁদের মধ্যে উদয়নও ছিলেন। উন্নতির লক্ষণ দেখে তাঁকে সেই শহরেই আলাদা বাড়ীতে রাখা সঙ্গত কি না ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

বাড়ী ভাড়া করলেন কোম্পানী বাগানের দিকে। নিজে সেখানে গিয়ে বাস করলেন। এটা বিপাশার অমতে নয়। বরং যত দূর বোঝা যায় তাঁরই ইচ্ছায়।

চাকরিটা ছেড়ে দিতেই হলো। পারিবারিক জমিদারি থেকে শরিক হিসাবে যা উদয়নের পাওনা তা দিয়ে কলকাতার খরচ চালানো যায় না। কিন্তু বহরমপুরের খরচ চলে। বিশ্ব-পরিক্রমার দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে উদয়নের কিসের অভাব যে তিনি চাকরি করবেন। তবে ওটা ছিল অনেকটা শখের চাকরি। ছাড়তে গড়িমসি করার কারণ এই। তিনি ভেবে দেখলেন যে বিপাশাকে একা ফেলে রাখলে ওঁর পাগলামি কোনো দিনই সারবে না।

৩

উদয়নের হেফাজতে বিপাশা বেশ সেরে উঠেছিলেন। সেরে ওঠার পর দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে দাদা এসেছিলেন। আশীর্বাদ করে গেলেন। তার চেয়ে বড় কথা বিপাশা নিজে উদয়নকে অন্তর থেকে ক্ষমা করেছিলেন। ক্ষমা চেয়েছিলেন।

সুতরাং সুখী হওয়ার পথে বাধা কোথায়? পাঁচটা বছর তাঁদের বড় সুখেই কাটল। কেবল ভয় ছিল কখন আবার পাগলামিতে পায়। সেইজন্যে পাগলা গারদ যখন বহরমপুর থেকে রাঁচীতে উঠে যায় তাঁরাও রাঁচী গিয়ে কাঁকে রোডে বাড়ী করেন। ভূপর্যটকের পর্যটন ওই পর্যন্ত।

বাকীটুকুন উদয়নের জবানীতে বলা যাক।—চিঠিখানা তাঁর কোনো বন্ধুকে লেখা।

*　　　*　　　*

আসলে ও ছিল ভয়ানক নিঃসঙ্গ। আমি থাকতেও নিঃসঙ্গ, আমি না থাকলে তো কথাই ছিল না। সেইজন্যে ও আমাকে গাছের গায়ে লতার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকত। বই কিনতুম। বই পড়তুম। বাগান করতুম। সঙ্গ দিতুম। আর কোনো দিকে দৃষ্টি ছিল না। আমি ছিলুম একচক্ষু হরিণ।

হঠাৎ একদিন স্নানের ঘরের মেজের উপর পা পিছলে পড়ে পাশার রক্তস্রাব হয়। ডাক্তার ছুটে এসে দেখে বললেন "তিন মাসের হবে।"

কতরকম জটিলতা দেখা দিল। পাশা চলে গেল, সজ্ঞানে। যাবার সময় বলে গেল, "তুমি আমাকে সত্যি ভালোবেসেছিলে। আগে যদি জানতুম তা হলে কি পাগলা গারদে যেতে হতো! তোমার সঙ্গে কত সুখে থাকতুম। এখন আমাকে অকালে স্বর্গে যেতে হচ্ছে। সেখানে আমি তোমাকে ছেড়ে একা থাকতে পারব না। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। আমাকে তুমি ভুলে যেয়ো না। ভালোবেসো।"

ভুলিনি। ভুলব না। ভালোবাসব। এইখানেই পড়ে থাকব ওর স্মৃতিটুকু আঁকড়ে। এখান থেকে আর-কোথাও যাওয়া তো ওর স্মৃতিকে পিছনে ফেলে যাওয়া। জীবনে কতবার কত জনাকে পিছনে ফেলে গেছি। নইলে কোথাও যাওয়া হতো না। আজ আর তাদের দিকে ফিরে তাকাতে ভালো

লাগে না। মনের আলবাম থেকে সব ছবি একে একে মুছে যাচ্ছে। জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে একখানিমাত্র ছবিকে।

পাগলা গারদে থাকতেই ও নতুন হয়ে উঠেছিল। ওটা শাপে বর। আমার ঘরে যখন এলো তখন ওর রূপ আর ধরে না। ওর বয়স দশ বছর পেছিয়ে গেছে। দেহে মনে হৃদয়ে পাশা আমার পূর্ণ বিকশিতা। স্বাস্থ্যেরও তার শারদ শ্রী। তার ও আমার দু'জনেরই দৃঢ় সংকল্প দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক করতে হবে। অতীতের জন্যে অনুশোচনা করা চলবে না। কারো উপর বিদ্বেষ পুষে রাখা চলবে না। সবাই মিলে আমাদের এগিয়ে দিয়েছে। যে লাথি মেরেছে সেও। যে দাগা দিয়েছে সেও। দেখতে গেলে ওরা আমাদের বন্ধু।

কোনখানে তা হলে ট্র্যাজেডীর বীজ গুপ্ত ছিল? আমি তো তার কাছে কিছুই লুকোইনি। সেও আমার কাছে। আমি লোকটা যে কেমন সে তা বছরের পর বছর পর্যবেক্ষণ করেছে। আমিও তাকে বার বার বাজিয়ে দেখেছি, আমার সঙ্গে থাকতে তার কোনো বিকারবোধ নেই। সে আমাকে অশুচি জ্ঞান করে না। সেই যে "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না" ভাব সেটার অস্তিত্ব ছিল না। তুমি তো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করে কী হবে? কতকালের একাদশীর পর পারণ! তারও। আমারও। এমন আনন্দ সেও কোনো দিন পায়নি। আমিও না।

ওকে পাগলা গারদ থেকে নিয়ে আসা অবধি আমি সব রকমে হুঁশিয়ার ছিলুম। তা সত্ত্বেও কেমন করে কী যে হয়ে

গেল! তিন মাসের! মাই গড! কেন যে টের পাইনি! কেন ডাক্তারকে বলিনি! একটি মেয়ের জীবনমরণের প্রশ্ন। আর আমি কিনা কেতাব নিয়ে পাগল! কেন আমি আরো ভালো করে আটঘাট বাঁধিনি! আমি ওকে পাগলা গারদ থেকে নিয়ে এসেছি। আমারই তো দায়িত্ব। ও যদি বা অসাবধান হয় আমার দায়িত্বের খণ্ডন হয় না। আমিই দায়ী। আমিই একমাত্র দায়ী।

সেই থেকে আমার মাথায় একটা পোকা ঢুকেছে। পোকাটা বেরোতে চায় না। দেখছি আমারও মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। পাশার তো অমন করে চলে যাওয়ার কথা নয়। ওর অকালমৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। আমি যে লেডী কিলার। আমার হাতে না পড়লে বেচারি পাশা পাগলও হত না। মরেও যেত না। আমার সঙ্গে থিয়েটারে সিনেমায় গিয়ে ভুল করেছে। সেই সময়টা পর্জন্যকে চোখে চোখে রাখলে ঠিক করত। মৃত্যুর আদি কারণ হলো এম্পায়ারে যাওয়া, ফিরপোতে খাওয়া। আমারি দোষ।

আর অব্যবহিত কারণ মেজেতে জল ঢালা। ঘরে বাথ-টাব ছিল। টাবে বসে নাইলেই চলত। কিন্তু টাবটা ছিল ছোট। বড় টাব কেনার কথা খেয়াল হয়নি। টাবের জলে শুয়ে থেকে সাবান মাখলে সেই জলে গ্লানি মোচন হয় না। সেইজন্যে আমরা শাওয়ার নিতুম। মেজেটা জলে ছপ ছপ করত। কোনো দিন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। কেন এরকম ঘটল? এক এক সময় সন্দেহ হয় যে পাশা চায়নি বলেই রাখেনি।

কিন্তু কখনো এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য হয়নি বলে জোর করে বলতে পারছিনে, ও চায়নি।

তা হলে মরণের ফাঁদ পেতে রেখেছিলুম আমিই। আমি যে লেডী কিলার তা হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে গেল। আমার যে ফাঁসি হয় নি এই ঢের। কিন্তু শেষ বিচার তো ইহলোকে নয়। পাশা যেমন হাসতে হাসতে স্বর্গে চলে গেল আমি কি তেমন পারব! আমি হয়তো কাঁদতে কাঁদতে নরকে যাব।

তা হলে ও আমার জন্যে স্বর্গে বসে অপেক্ষা করতে থাকবে অনন্ত কাল? তা কি হয়! বলা যায় না, হয়তো ফাউস্টের গ্রেটশেনের মতো ও আমার জন্যে প্রার্থনা করতে থাকবে স্বর্গের অধীশ্বরের কাছে। স্বর্গে যদি আমার ঠাঁই হয় তো ওরই শুভ্র অন্তঃকরণের ঐকান্তিক প্রার্থনার জোরে।

মনে পড়ছে আমি ওকে বলেছিলুম, "তুমি কি আমার সঙ্গ রাখতে পারবে?"

ও বলেছিল, "ছায়ার মতো।"

এবার আমার পালা। অন্তরাল থেকে আমি ওর সঙ্গ রাখব। ছায়ার মতো।

(১৯৫৬)